বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

হংকং
বঞ্চিত বাংলাদেশ

তানিম আহমেদ

তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত না নিয়েই গত ১৮ ডিসেম্বর হংকংয়ে শেষ হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ষষ্ঠ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এ সম্মেলনে যে তেমন কিছু হবে না, তা অবশ্য বেশ বহু আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল। সম্মেলনের সম্ভাব্য ঘোষণাপত্রের বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মতবিরোধ পৌঁছেছিল চরমে। এটা গত বছর জুলাইয়ের শেষে সংস্থার সাধারণ পরিষদের বৈঠকেই স্পষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী প্রতি দুই বছর অন্তর একটি মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন বাধ্যতামূলক। কানকুন সম্মেলন ভেঙে যাবার পর হংকং সম্মেলনও ভন্ডুল হলে সংস্থার অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে বিধায় এবারের সম্মেলনের একটিই বড় অর্জন হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে এটি হলো 'উন্নয়ন' সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশগুলো নাকি উন্নতি লাভ করবে। অথচ এবারের সম্মেলনের আসল এজেন্ডা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা ছিল কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে বিশেষত ব্রাজিল ও ভারতের হাতে। এখান থেকে বাংলাদেশের মতো ছোট স্বপ্নোন্নত দেশে তেমন অর্জন করার কিছু ছিল না। এ রকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও সম্মেলন চালানোর কারণটা বুঝতে গেলে একটু পেছনে যাওয়া প্রয়োজন।

দোহা ২০০১। সিয়াটল সম্মেলন প্রচন্ড বিরোধিতার মুখে ভেঙে যাবার পর গরিব দেশগুলোকে ভুলিয়ে রাখার জন্য শুরু হলো দোহা উন্নয়ন এজেন্ডা। দোহায় উন্নত দেশের মন্ত্রীরা প্রচন্ড চাপ দিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রভাবশালী মন্ত্রীদের রাজি করায় তাদের কথা মেনে চলতে। সম্মেলনের সময়সীমার ১৪ ঘন্টার পর বের হয় দোহা ঘোষণাপত্র। যাকে বলা হয় 'দোহা উন্নয়ন এজেন্ডা'। সময়সীমা নির্ধারিত হয় ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪। শুরু হয় নতুন রাউন্ডের আলোচনা। উন্নয়ন রাউন্ড বলা হলেও এখানে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় শুধু উন্নত দেশের জন্য, অন্যান্য দেশের জন্য নয়।

পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কানকুনে। উন্নয়নশীল দেশের একটি গ্রুপের প্রচন্ড বিরোধিতার মুখে তা ভেঙে যায়। এ সময় স্বল্পোন্নত দেশগুলোও উন্নয়নশীলদের পক্ষে চলে যায় এবং উন্নত দেশগুলোর বিপক্ষে দাঁড়ায়। কানকুন সম্মেলন ভেঙে গেলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দোহা রাউন্ড সময়সীমার মধ্যে শেষ হবে না। কিন্তু দোহা রাউন্ডের আসল সময়সীমা হয়ে দাঁড়ায় আমেরিকান প্রেসিডেন্টের 'ফাস্ট ট্র্যাক' কর্তৃত্ব, যার বলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তার দেশের পক্ষে বাণিজ্যিক আলোচনায় বসতে পারে। ২০০৭-এর মাঝামাঝি মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ক্ষমতা শেষ হবে এবং পরবর্তীতে যেকোনো বাণিজ্য আলোচনার জন্য মার্কিন সংসদীয় অনুমোদন প্রয়োজন হবে। ২০০৭-এর মধ্যে দোহা রাউন্ড শেষ করতে হলে এবং বাণিজ্য সংস্থার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করার লক্ষ্যেই জেনেভায় ২০০৪-এর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ পরিষদের সম্মেলন। এই সম্মেলনের ঘোষণাকে বলা হয় জুলাই ফ্রেমওয়ার্ক বা জুলাই প্যাকেজ।

কানকুন থেকে জেনেভা হয়ে হংকং পর্যন্ত বাণিজ্য আলোচনায় একটি নতুন মেরুকরণ হয়। দুটো উন্নয়নশীল দেশ ব্রাজিল ও ভারত উঠে আসে এবং আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে থাকে। কানকুনের পর থেকেই ব্রাজিল ও ভারত হয়ে দাঁড়ায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দুই নতুন শক্তি। এবারের হংকং সম্মেলন ছিল তাদের শক্তি প্রমাণের আরেকটি মহড়া। কানকুনের ব্রাজিল ও ভারতের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নশীল দেশের গ্রুপ জি-২০ আলোচনা ভেঙে দেয়। হংকংয়ে ভারত ও ব্রাজিল সম্মেলনের নিভু নিভু প্রাণকে জীবিত করার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে তারা চাইলে যেটা খুশি করতে পারে। আমেরিকা ও ইউরোপকে তাদের স্বার্থ হাসিল করতে হলে এই দুই দেশের সঙ্গে আলোচনায় বসতে এই কূটনীতির মধ্যে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ কখনোই মধ্য মঞ্চে আসার কোনো কারণ ছিল না, আসেওনি। বরং একেবারে শুরু থেকেই বাংলাদেশের চাহিদা ছিল দুটো। এক. মানবসম্পদ বা শ্রমের অবাধ যাতায়াতের অনুমতি। দুই. পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার। শ্রমের অবাধ যাতায়াত কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্পর্শকাতর দিকটি চিন্তা করলে কোনো দেশের পক্ষেই এ রকম কোনো শর্তে রাজি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে স্বল্পোন্নত দেশের সব পণ্যের অবাধ যাতায়াত কোনো অবাস্তব বিষয় নয়। ইউরোপ ও কানাডায় বাংলাদেশের অবাধ বাজার সুবিধা পেয়েছে। বর্তমানে পণ্যের অবাধ যাতায়াত অধিকতর প্রয়োজন শুধু আমেরিকায়। আর পণ্য বলতে মূলত তৈরি পোশাক।

সম্মেলনের শুরু থেকেই মার্কিন বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট। বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী বারবার ফাঁকা গর্জন করে যাচ্ছিলেন যে, উন্নত দেশে

প ট ভূ মি

গত ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ২২টি জেলায় এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়নের প্রান্তিকীকরণ' শীর্ষক মোট ২৪টি আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি আয়োজন করা হয়েছিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রিপরিষদের ৬ষ্ঠ সম্মেলনকে সামনে রেখে যা গত ১৩-১৮ ডিসেম্বর হংকংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক সভাগুলোয় এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের সহযোগী সংস্থাগুলোর ব্যবস্থাপনায় ঐসব অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পেশাজীবী যেমন প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র জেলে, তাঁতীসহ কয়েক হাজার নারী-পুরুষ সমবেত হন। তারা সেখানে তাঁদের জীবন ও জীবিকার অভিজ্ঞতার কথা, বিশ্বায়ন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণার কথা তুলে ধরেন। নাটক ও সঙ্গীতের মাধ্যমে বিশ্বায়নের কুফলের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ছিল হৃদয়গ্রাহী পরিবেশনা। প্রতিটি সভায় ঢাকা থেকে একজন মুখ্য শ্রোতা গিয়েছিলেন ঐসব দরিদ্র মানুষের কথা শুনতে, মতবিনিময় করতে এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে। পরবর্তীতে ঢাকায় ফিরে তাঁরা প্রত্যেকে এর ওপর একটি করে প্রতিবেদনমূলক রচনা তৈরি করেন। সেখান থেকে বাছাই করা কয়েকটি লেখা নিয়ে এই বিশেষ ক্রোড়পত্র। যেহেতু হংকং সম্মেলন শেষ হয়ে গেছে, সেহেতু সম্মেলনের ফলাফল এবং বাংলাদেশের ওপর প্রভাববিষয়ক একটি প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনও পত্রস্থ করা হয়েছে এই ক্রোড়পত্রে।

ক্রোড়পত্রটি **সাপ্তাহিক ২০০০**
এবং **এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের**
একটি যৌথ উদ্যোগ

সব পণ্যের প্রবেশাধিকার না পেলে তিনি ভেটো দেবেন। প্রায় দেড়শ' দেশের সংস্থায় একটি চুক্তি ভন্ডুল করার মতো সাহস বা রাজনৈতিক প্রভাব বাংলাদেশের নেই। অন্যদিকে বাণিজ্যিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের ফাস্ট ট্র্যাক কর্তৃত্ব সত্ত্বেও প্রায় ৫০০ পণ্য আছে যার অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য প্রয়োজন মার্কিন সংসদীয় অনুমোদন। সেটাও ঢাকা-ওয়াশিংটনের মধ্যে রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে হাসিল করতে হবে। আলতাফ হোসেন চৌধুরী অবশ্য ১০০ ভাগের স্থলে ৯৯.৯ ভাগ পণ্যের প্রবেশাধিকার দেখে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন সম্মেলনের শেষ দিকে। তাত আপাতত মনে হয়, খুব বেশি ছাড় দেয়া হয়নি। কিন্তু এর ফলেই বাংলাদেশের আমেরিকায় রপ্তানি করা পণ্যের ৪১ শতাংশ পর্যন্ত আটকানো সম্ভব। কারণ ঐ ০.১ শতাংশ নির্ধারিত হবে আমেরিকার ট্যারিফ লাইনের হিসাবে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো ট্যারিফ লাইনের ৯৭ ভাগ অবাধ প্রবেশাধিকার পাবে। অর্থাৎ কোনো দেশ যত পণ্য আমদানি করে তার ৯৭ ভাগ স্বল্পোন্নত দেশের জন্য উন্মুক্ত। বাকি তিন শতাংশ নির্ধারণ করবে আমদানিকারক দেশটি। এতে আমেরিকার স্পর্শকাতর সব পণ্যের বিশেষত পোশাক খাতের অবাধ প্রবেশাধিকার ঠেকানো যাবে। বাংলাদেশের বা অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের তেমন কোনো লাভ হবে না। কারণ তারা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাড়তি কোনো সুবিধা আদায় করতে পারবে না। বিষয়টি স্পষ্ট হয় একেবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ সম্মেলনের শেষ দিনে যখন শতকরা হারের একটি সংখ্যা বসানো হয়। তাতে অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের সায় থাকলেও বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার তেমন সুবিধা হবে না বলে জানা যায়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের আরেকটি সমস্যার কথা গত কয়েক মাস ধরে বলে আসছিল। গোটা বিশ্বের ক্রমাগত উন্মুক্ত বাণিজ্যের লক্ষ্যে সর্বত্র শুল্ক হ্রাস করা হচ্ছে। এতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সুবিধাজনক অবস্থান আর থাকছে না। আগে যেখানে ১৫ শতাংশ শুল্ক ছিল ভারতের জন্য, বাংলাদেশের জন্য শুল্ক লাগতো না। এখনো শুল্ক লাগছে না তবে ভারতের জন্য শুল্ক হার কমে হয়তো ৮২ শতাংশ হয়েছে। তাতে বাংলাদেশের লভ্যাংশ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলো দাবি করছিল উন্নয়নশীল দেশে। বিশেষত অধিকতর উন্নয়নশীল (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর) দেশের বাজারে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দেয়ার। এর পাল্টা জবাবে উন্নয়নশীল দেশগুলো ডাল, চাল দেয়। প্রথমে তারা জানায়, 'দরিদ্রতর' স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে তারা শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দিতে রাজি। অর্থাৎ সব স্বল্পোন্নত দেশ সমান না, কেউ কেউ অনেক যেমন বাংলাদেশ। তবে

বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আরো মারাত্মক অংশ হলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ক্রমাগত উন্মুক্ত বাজার সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে আগে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুমোদন লাগবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে পাকিস্তান স্বল্পোন্নত দেশের শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধার ঘোরতর বিরোধিতা করে বলে, বাংলাদেশকে যদি এরকম সুবিধা দেয়া হয় তবে পাকিস্তানও স্বল্পোন্নত দেশ হয়ে যাবে। ফলে শেষ পর্যন্ত ঘোষণাপত্রে একটি শর্ত যোগ করা হয়। তা হলো, শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা বিবেচনায় রাখতে হবে। ১৭ ডিসেম্বর উন্নয়নশীল দেশগুলোর এহেন বিরোধিতায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোও অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের জন্য আশঙ্কার বিষয় হলো সম্মেলনে এমন কথাও শোনা যায় যে, বাংলাদেশ আসলে স্বল্পোন্নত দেশ নয়, উন্নয়নশীল দেশ। ভারতীয় এনজিওদের পক্ষ থেকে গুঞ্জন তোলা হয়, বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া উচিত নয়, কারণ বাংলাদেশ আর সে অর্থে স্বল্পোন্নত দেশ নয়।

উন্নত দেশগুলো বহুদিন ধরে 'সাউথ-সাউথ' বাণিজ্য অর্থাৎ উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর কথা বললেও এ সম্মলনে তারা কোনো উন্নয়নশীল দেশকে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধার জন্য স্বল্পোন্নত দেশের হয়ে চাপ দেয়নি। এর মূল কারণ হলো তাদের স্বার্থ এবার উন্নয়নশীল দেশগুলোর হাতে প্রায় জিম্মি ছিল। এমনকি পুরো সম্মেলনের সাফল্য ছিল উন্নয়নশীল ব্লকের হাতে।

ব্রাজিল ও ভারত সম্মেলনের প্রথম দিন থেকেই বুঝিয়ে দেয় খসড়া ঘোষণাপত্রের ব্যাপারে তাদের আপত্তি আছে। তারা আমেরিকা ও ইউরোপকে একাধিকবার সরাসরি দোষারোপ করে। ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খেলখো এবং ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী কমল নাথ ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জানান, ঘোষণাপত্রে এখনো অনেক কাজ বাকি। সেদিন নতুন খসড়া অনুযায়ী একটি মাত্র বিষয়ের অগ্রগতি হয়। তাহলো কৃষি খাতে রপ্তানি ভর্তুকি বন্ধ করার সময়সীমা। এ ক্ষেত্রে ইউরোপ জানায়, ২০১৩-এর আগে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ব্রাজিল ও ভারত জানায়, ২০১০-এর আগে অবশ্যই সমস্ত রপ্তানি ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে হবে। তাদের আপত্তির মুখে পুরো সম্মেলনের আলোচনা ঝুলে থাকে। ১৭ ডিসেম্বর জি ২০-এর নেতৃত্বে সমগ্র উন্নয়নশীল বিশ্ব ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোসহ একটি ঐতিহাসিক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নতুন এই গ্রুপের দাবির মধ্যে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের দাবিগুলোও স্থান পায়। কিন্তু অন্যান্যবারের মতো এবারও প্রভাবশালী উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ উদ্ধার হবার পর অন্যদের দাবি নিয়ে তাদের আর মাথাব্যথা থাকেনি।

হংকংয়ে সম্মেলনের শেষ দিন সকাল পর্যন্ত ভারত ও ব্রাজিলের বিরোধিতায় আলোচনা ঝুলে থাকে এবং আপাততভাবে মনে হয় এবারও সম্মেলন ভেঙে যাবে। বাংলাদেশের জন্য সুবিধাজনক কিছুই আদায় করতে না পেরে বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আলোচনা ভেঙে যাবে এবং তাতে বাংলাদেশের জন্য সুবিধাই হবে।

কিন্তু শেষ কয়েক ঘন্টায় পুরো চিত্র বদলে যায়। রপ্তানি ভর্তুকির সময়সীমা হিসেবে ২০১৩ সালেই রাজি হয় ব্রাজিল ও ভারত। তাদের সমর্থন ও প্রভাবের কারণে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ ও বিভিন্ন গ্রুপ, জি-২০, জি-৩৩ ইত্যাদি ঘোষণাপত্রে সমর্থন দেয়। আলতাফ বারবার ভেটো দেবার কথা বললেও বিকেলের পর থেকে তার সঙ্গে কথা বলার কোনো সুযোগ হয়নি। তিনিও সাংবাদিকদের কোনো সাক্ষাৎকার দেননি।

উল্লেখ্য, রপ্তানি ভর্তুকি উন্নয়নশীল দেশগুলোর সবচেয়ে বড় দাবি ছিল। এতে তারা আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বল্পোন্নত দেশে তাদের কৃষিপণ্য রপ্তানি করতে পারতো। এ দাবি বেশ কিছু দিনের। এতে সুবিধা তাদেরই হবে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। গরিব দেশগুলো তাদের দাবির কথা জোরেসোরে বলার আগেই বা পরিস্থিতি বোঝার আগেই আলোচনার মোড় ঘুরে যায়।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ও অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের উচিত হবে উন্নত দেশের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গেও আলোচনায় বসা এবং কোনো বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সমর্থন দেবার আগে নিজেদের স্বার্থ বিবেচনা করা। সে জন্যে যে ধরনের মেধা, বিচক্ষণতা ও একাগ্রতা প্রয়োজন, বর্তমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশের জেনেভার মিশনের তা নেই। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখন বিভিন্ন দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হয়ে উঠেছে। এই মন্ত্রণালয়কে কোনোভাবেই অবহেলা করা উচিত হবে না।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চায় কৃষক না থাকুক, এখন থেকে বড় বড় কোম্পানি বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন করবে আর বাণিজ্যের মাধ্যমেই মানুষের ক্ষুধা মেটাবে! তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বহুজাতিক কোম্পানি উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ওপর অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি চায়..

আদিবাসী নারীরাও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন

কৃষকের উৎপাদনের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে হবে

ফরিদা আখতার

সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ জেলা। ঢাকা থেকে খুব দূরে না হলেও সাভারের কাছাকাছি গিয়ে যখন বাঁ দিকে রাস্তায় যেতে হয় তখনই উন্নয়নের বৈষম্য ধরা পড়ে। ডিসেম্বরের ৮ তারিখ সকালে আমরা সেখানে গেছি ভার্ক আয়োজিত 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা' শীর্ষক একটি সভায় যোগদানের জন্য। রাস্তা ভাঙা, গাড়ি একটু এদিক ওদিক হলেই খাদে পড়ার সম্ভাবনা। ঢাকার কাছে হলেই সব কিছুই উন্নত হবে আর দূরে হলে হলে না, এটা যে ঠিক নয়, সে সত্যটাই আরও একবার জানলাম। আসলে গরিব মানুষের অবস্থা সবখানেই এক। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও গরিব মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর যে প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে সরাসরি এলাকার মানুষের কাছে শোনার এই সুযোগ আমার কাছে খুব বড়।

ভার্ক আয়োজিত এ সভায় মাঠ পর্যায়ের তথ্য লিখিতভাবে পরিবেশন করা হয়। এতে ছিল কৃষির কথা, ইটভাটা ও মিল ফ্যাক্টরির কথা, বাজার এবং যান্ত্রিক যানবাহনের কথা। কৃষি প্রসঙ্গে বিশেষত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ, কলের লাঙ্গল সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা একেবারে বাস্তব। কৃষকদের দুঃখ- দেশীয় বীজ হারিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে হাইব্রিড বীজ উচ্চ মূল্যে কিনতে হচ্ছে, বীজ রাখা যায় না। একই সাথে তাঁরা বলছেন, রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়েছে এবং কীটনাশকের কারণে মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। কলের লাঙ্গল কৃষকের জমির ক্ষতি করে এবং জমিতে আগাছা ছড়িয়ে পড়ে, নিড়ানি খরচ বেড়ে যায়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ ভর্তুকির প্রশ্নটি আছে। অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকের সহায়তা দেয়া হচ্ছে কি না। এই প্রশ্নটি ন্যায্য, কিন্তু ভর্তুকির প্রেক্ষিতে আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের দেশের কৃষির অর্থ হচ্ছে, সর্বোচ্চ ৩ হেক্টর জমির মালিক, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ (৭%) হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক যাদের জমি ১- ৩ একরের মধ্যে। প্রায় ১০% কৃষি পরিবার আছেন যাদের কোনো জমি নাই, কিন্তু কৃষি কাজ নিয়োজিত। অন্যদিকে ধনী দেশে কৃষকের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগও নেই। তাদের আছে বড় বড় কোম্পানি যেমন মনসান্তো, সিনজেন্টা, এভেন্টিস, পাইওনিয়ার ইত্যাদি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চায় কৃষক না থাকুক, এখন থেকে বড় বড় কোম্পানি বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন করবে আর বাণিজ্যের মাধ্যমেই মানুষের ক্ষুধা মেটাবে! তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বহুজাতিক কোম্পানি উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ওপর অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি চায়, যেন তাদের যে খরচ পড়ে তার চেয়ে কম দামে বিশ্ব বাজারে বিক্রি করতে পারে। সিঙ্গাইরে কৃষকরা নাটকের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনের খরচ অনেক বেশি। সার-বিষের দাম বেশি, সেচের পানি, কলের লাঙ্গল, হাইব্রিড সবই দাম দিয়ে কিনতে হয়। মণপ্রতি খরচ ৩৮০ টাকা, কিন্তু বাজারে দাম মাত্র ৩৫০ টাকা। প্রতি মণে ৩০ টাকা ক্ষতি হচ্ছে কৃষকেরা বিদেশের কোম্পানিগুলোর খরচ এবং বাজারের দামের পার্থক্য এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি। কিন্তু যেহেতু তারা অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি দিয়ে এই ক্ষতি পুষিয়ে দেয় তাই তারা আরামে বাজারে কম দামে বিক্রি করতে পারে। মনে রাখা দরকার ধনী দেশেও গরিব কৃষক আছে তারা ভর্তুকির এই সুযোগ পায় না। ভর্তুকি সুবিধা পায় কোম্পানিগুলো। এটা ঘোরতর অন্যায়। তবে ওদের সঙ্গে ভর্তুকির প্রতিযোগিতায় আমরা কখনোই পারবো না। আমাদের সরকারের অতো টাকা নাই যে কৃষকদের ভর্তুকি দেবে। বিশ্ব ব্যাংক ভর্তুকি না দেয়ার জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে ভর্তুকি দেয়া হয় মূলত সার-বিষ, সেচের পানি ও ট্রাক্টরের জন্যে। এতে কৃষকের কোনো উপকার যে হয়নি, তা কৃষকদের কথা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। তেলের মূল্য বাড়লেও সেচ ট্রাক্টরের খরচ বাড়ে। এর অর্থ হচ্ছে, আমাদের কৃষিতে ভর্তুকি দেয়ার দাবি করে এই মুহূর্তে আমরা লাভবান হতে পারবো না। কিন্তু আমাদের দাবির জের ধরে ওরা কোম্পানির পক্ষে চুক্তি করতে পারবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তির অধীনে ধনী দেশের অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি কমিয়ে ফেলার দাবিই আমাদের জন্য বেশি জরুরি।

কৃষকরা বুঝেছেন, দেশীয় বীজ হারানোটাই আমাদের চরম ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে। হাইব্রিড বীজে বেশি ফলনের যে কথা আছে তা সঠিক প্রমাণিত হয়নি, অথচ ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে এই হাইব্রিড বীজ ব্র্যাকের মতো বড় এনজিওরা কৃষকদের নিতে বাধ্য করছে। আশার কথা এই যে, এখনো নারীদের মধ্যে

স্থানীয় বীজের প্রতি মমতা আছে। তাই তারা নিজেরা যে বীজ সংগ্রহে রাখেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশীয় বীজ। সিঙ্গাইরে সভায় কয়েকটি লোক কেন্দ্র থেকে আসা মহিলারা যে ফসল নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে অন্তত তিন জাতের শিম যেমন হাতি কাইন্যা শিম, নলঠোস শিম, ঘিয়া শিম দেখেছি। বেগুন দুই রকম দেখলাম, যেমন কাঁটা বেগুন, দেশাল বেগুন। জুলেকা এবং হাসিনা সবজি নিয়ে বসেছিলেন। তারা নিজ নিজ ফসল সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন। একটা খুব বড় জাতের কামরাঙ্গা ছিল, সঙ্গে ছিল গুরা লেবু। কৃষকের ফসলের এতো বৈচিত্র্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তির বিষয় নয়। তারা মাত্র কয়েকটি ফসল নিয়ে ব্যবসা করবে। বহুজাতিক কোম্পানির স্বল্প সংখ্যক ফসলের একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের ফসলের বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে।

ক্ষেতে ফসল খুব ভালো হয়েছে কিন্তু বাজারে গিয়ে মাথায় হাত। এই কথা নাটকের মধ্য দিয়ে এবং আলোচনায় এসেছে। একদিকে উৎপাদন মূল্য বেশি হলে বাজারের দরের সঙ্গে টিকে থাকা মুশকিল হয়। অর্থনীতির সূত্র ধরে বাজারে সরবরাহ বাড়লে দাম কমে যায় এটা কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রযোজ্য। কৃষকের শুকনো ফসল ছাড়া অন্য ফসল সংরক্ষণের সুযোগ নেই। ছোট কৃষক তা মোটেও পারে না। মেয়ে বিয়ে দেয়া, সন্তানের পড়ার খরচ, ধারদেনা শোধ করার সব পরিকল্পনাই এই ফসলের আয়ের ওপর নির্ভর করে। কাজেই ফসল তোলার পর ভালো দাম পাওয়া না গেলে ফসল ভালো হয়েও লাভ হয় না। এ ছাড়া মরার ওপর খাড়ার ঘা হিসেবে আসে বিদেশ থেকে আমদানি করা কৃষি পণ্য। আমদানি করা চাল, ডাল, তেল, আদা, রসুন, পেঁয়াজ বাজারে কমদামে পাওয়া যায়, তাই শহরের মানুষ, দৈনিক মজুরির ওপর নির্ভরশীল। মানুষ কেজি প্রতি একটাকা কম পেলেই সেই পণ্য কেনে। তারা খোঁজ নেয় না এই পণ্য কি তারই কৃষক বাপ-চাচার উৎপাদিত নাকি বিদেশ থেকে আসা! ভারতে কৃষকদের সরাসরি ভর্তুকি দেয় না, তবে তারা রপ্তানির ওপর ভর্তুকি দিয়ে বাজারে কৃত্রিমভাবে মূল্য কমিয়ে দেয়। এর সুবিধা পায় রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আমদানিকারক দেশের কৃষকরা। কৃষি চুক্তির মূল আলোচনাটাই হওয়া উচিত বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ভর্তুকি (Trade Distorting Subsidies (TDS) কমানো। রপ্তানি ভর্তুকি নতুন চুক্তির শুরু থেকেই বাতিল করতে হবে। ধনী দেশগুলো এই পর্যন্ত সত্যিকারের কৃষি পণ্যের বাজার সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আয় করতে পারেনি, তারা আয় করছে ভর্তুকির মাধ্যমে। ধনী দেশগুলোর মূল কৃষি আয়ের শতকরা ৩০% এসেছে কৃষি ভর্তুকির মাধ্যমে। এর পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেছে ২৮০ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্বায়নের কুফল তুলে ধরা হচ্ছে নাটিকার মাধ্যমে

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই ১৯৯০-এর দশকে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শে (!) সরকার বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করেছে। আমদানি উদারীকরণ করার কারণ তেল, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আদা উৎপাদনকারী কৃষকরা উৎপাদন করতে পারছেন না। কারণ বাজারের দামের সাথে তাঁরা টিকতে পারছেন না। এলাকার কৃষকরা জানালেন, সিঙ্গাইয়ের অনেক পেঁয়াজ হতো কিন্তু এখন তা কমে গেছে। বাংলাদেশে মৎস্য শিল্প ছাড়া অন্যরা রপ্তানি ভর্তুকিও পায়নি। মৎস্য শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিংড়ি রপ্তানি, যা কৃষকের খাদ্য উৎপাদনের বিশেষ করে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে ব্যাপকভাবে।

সিঙ্গাইরে সভায় একটি ভালো দিক ছিল এই যে, সেখানে উপস্থিত উপজেলা কৃষি অফিসার স্পষ্ট ভাষায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবস্থার কমাবার কথা বললেন। তিনি অভিযোগ করলেন, এলাকায় গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। জমির উর্বরাশক্তি সংরক্ষণের জন্য জৈব সারের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি খুব গুরুত্ব দিলেন। একজন রাজনৈতিক নেতার ভাষাও ছিল আমাদের আদি ফসলের পক্ষে। তিনি আপেক্ষ করলেন, পান্তা ভাত দিয়ে খাওয়ার বীচি কলা নেই, দুধ-দই দিয়ে খাওয়ার শবরি কলা হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে দুর্লভ ধানের বীজ। তিনি স্পষ্ট করে বললেন, উৎপাদন হয়তো বাড়িয়েছি কিন্তু বহু জিনিস হারিয়েছি। বিদেশী পণ্যের নির্ভরশীল হয়ে আমরা আমাদের সম্পদ হারাচ্ছি। আমি খুশি হয়েছি, একজন রাজনৈতিক নেতার মধ্যে এই মনোভাব দেখে। তিনি আসলেই বুঝছেন মানুষের জীবন-জীবিকা এই প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ওপরই নির্ভর করে। আমাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রকে ঠিক না রেখে কি দিয়ে বাণিজ্য হবে?

কৃষকের ফসলের এতো বৈচিত্র্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তির বিষয় নয়। তারা মাত্র কয়েকটি ফসল নিয়ে ব্যবসা করবে। বহুজাতিক কোম্পানির স্বল্প সংখ্যক ফসলের একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের ফসলের বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যায় চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বারে বারে ফিরে আসছি কি করে আমাদের নিজেদের উৎপাদন বাড়াতে হবে, নিজেদের সম্পদ রক্ষা করতে হবে এই প্রশ্নে। এর সঙ্গেই জড়িত রয়েছে আমাদের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন। তার চেয়েও বড় কথা, এর সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতি, সামাজিক অবস্থা সব কিছুই নির্ভরশীল। নারীর সম্মান, ক্ষমতা, জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। বিশ্ব বাণিজ্য আমাদের কিছুই দিতে পারবে না, যতক্ষণ না ধনী দেশের কৃষক এবং উন্নয়নশীল দেশের কৃষক সমপর্যায়ে বসে কথা বলতে পারছেন। উন্নয়নশীল দেশের কৃষকের পক্ষে এফবিসিসিআই-এর প্রতিনিধি আর ধনী দেশের পক্ষে বহুজাতিক কোম্পানি বসলে বাণিজ্য হবে না, তা হবে সন্ত্রাস!

সীতাকুণ্ডুর অভিজ্ঞতা

সেলিনা হোসেন

এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রান্তিকীকরণ' শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম সীতাকুণ্ডু। ৮/১২/২০০৫ সালের ভোরবেলা জিএমজি বিমানে করে চট্টগ্রামে পৌঁছি। আমরা ছিলাম চারজন। এ্যাকশন এইডের মোহাম্মদ জাকারিয়া ও শিহাবউদ্দিন আহমেদ এবং এটিএন বাংলা টিভি চ্যানেলের সাকিল আহমেদ। চট্টগ্রামে পৌঁছে আমি আর জাকারিয়া সাহেব সীতাকুণ্ডুর উদ্দেশে রওনা করি। অন্য দু'জন চট্টগ্রাম শহরের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চলে যান।

বিমানবন্দর থেকে সীতাকুণ্ডু যেতে দুই ঘন্টা লাগে। সীতাকুণ্ডুতে যেখানে অনুষ্ঠানটি হবে সেটি YPSA-র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আগের দিন সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন শামীম আহমেদ। সুতরাং শামীম জাকারিয়া সাহেবের মোবাইলে বারবার খোঁজ নিচ্ছিল যে আমরা কতটা পথ এগুলাম। শামীম এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের রিফ্লেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিটে যুক্ত আছেন। তাঁর কাছে রিফ্লেক্ট সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন, 'এটি হলো সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান চেষ্টার একটি অংশগ্রহণমূলক প্রয়াস।' দুটো শব্দ আমার কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। একটি 'বিশ্লেষণ' অন্যটি 'সমাধান'। দুটোই বেঁচে থাকার জন্য খুবই অপরিহার্য শব্দ। সমস্যার বিশ্লেষণ এবং সমাধান খুঁজে বের করাই তো উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত।

আমি কয়েক বছর আগে সীতাকুণ্ডু এসেছিলাম বিজয় উৎসবে যোগ দিতে। এই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। পাহাড়-সমতল-সমুদ্র মেখলার একটি চমৎকার মনোরম পরিবেশ আছে এখানে। প্রচুর শাকসবজি জন্মায়। গতবার দেখেছিলাম, এবারও দেখলাম শাক-সবজির প্রাচুর্য। পাহাড়ের গায়ে আছে ঝরনাধারা। এখানকার ঝরনাটি একমুখী নয়, বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে অনবরত জল গড়ায়। তাই এই ঝরনার নাম সহস্রধারা। পাহাড়ের চূড়ায় আছে মন্দির। একশ'র ও বেশি সিঁড়ি ভেঙে সেই মন্দিরে উঠতে হয়। বাড়বকুণ্ডে আছে একটি কূপ। যে কূপে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ফেললে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে। ভাবা যায়, হয়তো গ্যাস আছে। আছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি নিয়ে। কিন্তু নেই মানুষের জীবনের মর্যাদা, নেই অভাব থেকে মুক্ত জীবন। শিক্ষাদীক্ষায় আলোকিত মানুষের জনপদ খুঁজে পাওয়া যাবে না এখানে।

তবে দুটো পরিবর্তন আমি দেখতে পেয়েছি। একটি সীতাকুণ্ডে ইকোপার্ক তৈরি হয়েছে, অপরটি PHP গ্লাস ফ্যাক্টরি। এই দুটো স্থাপনার মাধ্যমে মানুষের জীবনে খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এগুলো মানুষের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে এই স্থাপনার বিষয়ে অভিযোগ শুনেছি।

এই অনুষ্ঠানে যোগদান করা ছিল আমার জন্য একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতার বিষয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-অভিজ্ঞতা শুনবো সেটি আমার বড় পাওনা হবে। এই সব দরিদ্রতম মানুষেরা জানে না উন্নয়ন কী। খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই তাদের স্বপ্ন।

অনুষ্ঠান স্থানে পৌঁছে দেখি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন রিফ্লেক্ট পরিচালিত লোককেন্দ্র, বিভিন্ন সার্কেল এবং গ্রাফিক্সের কর্মীবৃন্দ। আরও আছেন স্থানীয় বরেণ্য ব্যক্তি এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ। আমরা নির্ধারিত সময়ে না পৌঁছাতে পারার কারণে অনুষ্ঠান একটু দেরিতে শুরু হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন YPSA-র প্রোগ্রাম অফিসার মোহাম্মদ হারুন। প্রথমেই 'গরীব মানুষের কথা কে বলবে?' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনান জেনিফার আক্তার। তারপর শুরু হয় 'জীবন নদী' শীর্ষক কেসস্টাডি উপস্থাপন।

প্রথমে উপস্থাপিত হয় আলোর দাসের জীবন নদী। তাঁর জীবন কাহিনী শেষ হয়েছে এভাবে : 'আর্থিক দুর্বলতা, সমস্যা এবং অকালে স্বামী হারায়ে আমি দিশেহারা। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারি নাই। মেয়েকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ায়ে ঝিয়ের কাজ দেই। ছেলের চাকরি নাই। আমারও এখন তেমন আয় নাই।'

হতদরিদ্র এই সব মানুষ বিশ্বায়ন বোঝে না। বোঝে নিজেদের সমস্যা। সমস্যার শেকড় যে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত এ ধারণা তাদের পেতে হবে। এই ধারণা তৈরিতে সহায়তা করছে রিফ্লেক্ট পরিচালিত লোককেন্দ্রের কর্মীরা।

পরবর্তী জীবন নদীর জীবন হরিনার। দুঃখ-দৈন্যে ভরা সমস্যা আক্রান্ত জীবন ও দিন বয়ে চলেছেন। শেষে লিখেছেন : 'বিশ্ববাজারে জিনিসের দাম যে হারে, বাড়ছে ইচ্ছাপূরণ করা তো দূরের কথা, বেঁচে থাকাও কঠিন হয়ে পড়বে।'

এই জীবন নদীর কাহিনীতে বিশ্ববাজারের কথা এসেছে। জিনিসের দাম কোথায় বাড়ে তিনি সরাসরি না জানলেও জানেন, বিশ্ববাজার নামক একটি জায়গা আছে, যেখানে নিয়ন্ত্রিত হয় গরিব মানুষের ইচ্ছাপূরণের অনেকখানি। এভাবে ধীরে ধীরে গরীব মানুষের ঘরে ঢুকছে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের ধারণা।

তৃতীয় জীবন নদীটি ছিল নূর জাহানের। তিনি শেষে লিখেছেন : 'বিশ্ববাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকলে এ দেশের পণ্য বিশ্ববাজারে টিকতে পারবে না।'

এই কেসস্টাডি উপস্থাপন করেন শিউলী রানী দেবী। তিনি ভুঁইয়াপাড়া লোককেন্দ্রের সদস্য। পরবর্তী জীবন নদী উপস্থাপন করেন তসলিমা নাসরিন। তিনি জেসমিনের জীবন নদীর কাহিনী বলেন। জেসমিন তাঁর কাহিনী শেষ করেছেন এভাবে : 'প্রয়োজনীয় পণ্যের বেশি দাম এবং মজুরি কম হওয়ায় বিশ্ববাণিজ্য জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।'

জীবন নদীর অর্থ প্রান্তিক মানুষের জীবন বিশ্লেষণ। যাদের জীবন নদী উপস্থাপিত হয়েছে তারা সবাই প্রান্তিক নারী এবং নারীদের জীবন বিশ্লেষণ থেকে জীবনযাপনের প্রান্তিকীকরণই স্পষ্ট হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য রহিমা বেগম গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। কথা বলেছেন

জাতীয় সভায় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন একজন প্রান্তিক নারী

অনেক নারী। সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিতিদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই ছিলেন নারী। নারীরা খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। জীবন-যাপনের সমস্যার কথা বলেছেন। তাঁদের জীবন-জীবিকা ক্রমাগত দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। এর উপায় হিসেবে ওরা স্থানীয় সরকার প্রশাসন পর্যন্ত কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য যেতে পারে। তবে তাদের সচেতনতা নিজেদের সমস্যা বোঝার জন্য অনেক বেশি সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয় পুল্প বিশ্লেষণ। ফ্লাওয়ার টুলস হিসেবে পরিচিত এই গ্রাফিক্স প্রথমে উপস্থাপন করেন ফারহানা তসলিম নীপা। তার সার্কেলের নাম 'স্বাধীন'। এই পুল্প বিশ্লেষণের প্রধান বিষয় 'পেশা কৃষি'। এই পুল্প বিশ্লেষণে কৃষি কী কী কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে সমস্যা কোথায় আর সমাধানই বা কি। পরবর্তী পুল্প টুলস্রে বিষয় 'পেশা দিনমজুর'। এই বিশ্লেষণেও একইভাবে সমস্যা সমাধান ও উত্তরণের

জীবন নদীর অর্থ প্রান্তিক মানুষের জীবন বিশ্লেষণ। যাদের জীবন নদী উপস্থাপিত হয়েছে তারা সকলে প্রান্তিক নারী এবং নারীদের জীবন বিশ্লেষণ থেকে জীবনযাপনের প্রান্তিকীকরণই স্পষ্ট হয়েছে

প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে পুল্পের প্রতিটি পাপড়িতে। বিশ্লেষণ করেছে সংগ্রাম সার্কেল। পরবর্তী ফ্লাওয়ার টুলস্ করেছে ভুঁইয়াপাড়া লোককেন্দ্র। বিষয় : 'পেশা ক্ষুদ্র ব্যবসা'। একইভাবে তৈরি এই পুল্প বিশ্লেষক। উপস্থাপক জেনিফার আখতার। পরবর্তী ফ্লাওয়ার টুলস্ করেছে সার্কেল অনির্বাণ। বিষয়: 'জেলে'। এটিও একইভাবে তৈরি করা হয়েছে। উপস্থাপক শিউলী রাণী দেবী। পরবর্তী ফ্লাওয়ার টুলস্ করেছে সার্কেল জাগ্রত আগামী। বিষয় : 'কৃষি'। আগেরগুলোর মতই একইভাবে তৈরি করা হয়েছে। উপস্থাপক সাবিনা ইয়াসমিন। এরপর প্রাণবন্ত আলোচনা করেন উপস্থিত সবাই। সভায় উপস্থিত ছিলেন সীতাকুন্ডু কলেজের বাংলার অধ্যাপক এবং একজন গুণী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র তরিকুল ওমর। সভা পরিচালনা করেন এ্যাকশন এইডের মোহাম্মদ জাকারিয়া।

জাতীয় আলোচনা সভার সার বক্তব্য

গত ১১ ডিসেম্বর ঢাকায় এলজিইডি মিলনায়তনে 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা : দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়নের প্রান্তিকীকরণ' শীর্ষক জাতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এক হাজারের বেশি গরীব নারী-পুরুষ সমবেত হন। সভাটি ছিল ৮ ডিসেম্বর ২২ জেলায় অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সভাসমূহ থেকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মুখ্য শ্রোতাদের আলোচনা এবং উপস্থিত গরিব মানুষদের অভিজ্ঞতা ও অভিমতের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ঘোষণাপত্র তৈরির। সভায় মুখ্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান এবং এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর নাসরিন হক। দিনব্যাপী আলোচনায় যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে তার সার সংক্ষেপ এরকম :

১. উদারীকরণের ফলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সমঝোতা আলোচনায় গরিব শ্রমিকের অধিকার রক্ষিত হয়নি।

২. উপকরণের চড়া মূল্য আর উৎপাদিত পণ্যের নিম্ন দরের কারণে কৃষকরা ন্যায্যমূল্যসহ সবদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৩. চিরাচরিত দেশীয় প্রথায় কৃষক কর্তৃক বীজ সংরক্ষণ প্রবণতা কমে এসেছে, যা

বাঁ থেকে নাসরিন হক, সলিমুল্লাহ খান ও সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান

কালক্রমে কৃষককে বিভিন্ন কোম্পানির পেটেন্ট করা বীজের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলবে।

৪. রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি হারিয়ে যাচ্ছে আর বহুজাতিক কোম্পানির পণ্যের ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলছে।

৫. উদারীকরণের ফলে সাধারণ ও গরিব মানুষ তাদের জন্য অপরিহার্য এমন অনেক পণ্য কেনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

৬. রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মধ্যস্বত্বভোগীরা গরিব কৃষকের লাভের মোটা অংশটাই নিয়ে যাচ্ছে।

৭. উদারীরকণের ফলে নারী-পুরুষের শ্রমের বৈষম্য বাড়ছে।

৮. উদারীরকণের ফলে কাজের সুযোগ সংকুচিত হয়ে শ্রমের বাজারে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে।

৯. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিশ্বায়ন দারিদ্র্য হ্রাসে এবং পরিবেশের বিপর্যয় রোধে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখেনি।

১০. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ মাথায় রাখতে হবে এবং দেশপ্রেমের জায়গা থেকে কাজ করতে হবে।

১১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম-নীতির যেকোনো পরিবর্তনে গরিব মানুষের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

১২. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গরিব মানুষের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে– এটি একটি কাল্পনিক কথা।

কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ

সলিমুল্লাহ খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নবিদ্যা বিভাগ ও এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ- দুই প্রতিষ্ঠানের দাওয়াতযোগে ঢাকার অদূরের এক না শহর না গ্রাম (সিঙ্গাইর উপজেলা সদরের কাছাকাছি) সফরের সহজ সুযোগ পেয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নবিদ্যা বিভাগের ছাত্র হাসান শরীফ ছাড়াও আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন এ্যাকশনএইডের সাফিয়া আপা, নিগার আপা। মিরপুর থেকে যোগ দিলেন এ্যাকশন এইডের সারানা মুজাদ্দিদ। বলা প্রয়োজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নারীনেত্রী ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ফরিদা আপাও একই যাত্রায় শরিক হয়েছেন। ফলে ভোর যেভাবে শিশির ঝরিয়ে সকাল হয়, আমাদের অজ্ঞান আনন্দও সেদিন এইভাবে নানাবিধ সজ্ঞান গৌরবে পরিচয় পাচ্ছিল। সেদিন ২৪শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর। ভরা ক্ষেত খালি হয়েছে এতদিনে। পৌষ এখনও সামনে। দেড় ঘন্টার ভেতর আমরা সিঙ্গাইর পৌঁছলাম।

ঢাকা-আরিচা বড় রাস্তা ছেড়ে হেমায়েতপুরের কাছে আমরা সিঙ্গাইরমুখী পথ ধরি। পাঁচ মিনিট পরই আমাদের দেখা হল উন্নয়নের সঙ্গে। সামনেই পাকা সেতু। টোল আটত্রিশ টাকা। আসতেও কাটে যেতেও কাটবে। জানতে পারলাম জিজ্ঞাসা করে। পথের পাশে খাদ গভীর। রাস্তা চওড়া নয়। দুটো গাড়ি পাশাপাশি হলে একটি কেন খাদে পড়ে যায় না সেটি যেমন আনন্দের তেমনি রহস্যের ব্যাপার। সারানা বললেন, 'আপনি কি কখনো আট দশ বছর আগেও ঢাকা থেকে জাহাঙ্গীরনগর গেছেন ? সেই পথও এরকম ছিলো।' আমি অস্বীকার করলাম। আরো কথা হল। জানলাম সারানা জাহাঙ্গীরনগরে নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। অধ্যাপিকা রেহনুমা আহমেদের সুনাম করলেন তিনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম অধ্যাপিকার লেখা বাংলা এত কঠিন অথচ তার এত ভক্ত ছাত্র ছাত্রী। রহস্যটা কোথায়? সারানা আমাদের অজ্ঞতা কিছুটা কমানোর চেষ্টা করলেন। বললেন ম্যাডাম যখন পড়ান তখন নিজের দেহ মন প্রাণ সবটাই উজাড় করে পড়ান। তাঁর লেখা কঠিন। সারানা স্বীকার করলেন। কিন্তু কথা বললে সহজ হয়ে যায়। আমি আঁতেলের ভান করি। তাহলে লেখা কেন এতখানি বোধের অতীত? তখন রেহনুমা আপার শিক্ষক অধ্যাপক বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের গদ্যরীতির কথা উঠল। কে একজন টীকা যোগ করলেন, অধ্যাপক জাহাঙ্গীরের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য লেখা থিসিস মানিকগঞ্জেরই কোন এক বা দুই গ্রামের বিষয়-কৃষক জীবনের শ্রেণী সংগ্রাম- নিয়ে। সেই থিসিস প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা যখন সিঙ্গাইর পৌঁছলাম তখনও সেখানে স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার বা ভার্কের জাতীয় নেতারা সাভার এসে পৌঁছাননি। শেষমেশ বেলা ১১টা নাগাদ নির্ধারিত মিছিল ও সভা শুরু হল। ছবি তোলার জন্য ফরিদা আপাকে আর আমাকে মাইকের সামনে দাঁড়াতে হল। কিছুক্ষণ পর খবর পেলাম এ্যাকশন এইডের দেশ পরিচালক নাসরীন হকও সিঙ্গাইর আসবেন। কারখানা এলাকায় মধ্যরাতে বিদ্যুতের ভোল্টেজ বৃদ্ধির মত আমাদেরও সাহস বাড়ল। সভা চলছে। একসময় সাফিয়া আপা আমার কানে কানে বললেন, 'স্যার নেত্রকোনায় বোমা হামলা হয়েছে। অনেকে হতাহত হয়েছে। আমাদের পাহারা হিসেবে এখানে পুলিশ মোতায়েন আছে।' তিনি ফোনে এই খবর পান। সঙ্গে খবর পেয়েছিলেন হামলা আরো দুই জায়গায় হয়েছে। একটা নওগাঁয় আরেকটা চাটগাঁয়। পরে জানলাম নওগাঁয় হামলা হয়েছে আগের দিন। চাটগাঁয় সেদিন হামলা হয় নাই। আতঙ্কের মধ্যে সংকেত হল সভা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। ঢাকায় ফেরার কর্তব্য তো রয়েছেই।

মূল সভা আশ্চর্য রকম সুন্দর হল। কোন অনুষ্ঠানে এত গোছানো ভাব আমি অনেকদিন দেখি নাই। সাতের কম বয়সী পাঁচ ছয় জন শিশুর মূকনৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

খানিক কৌতুক মেশানো কিছু নাটকের দৃশ্য, কিছু লোকরীতির গান এবং আদ্যের গম্ভীরা গেয়ে সিঙ্গাইরের উন্নয়ন কর্মীরা কয়েকটা বিষয় আমাদের সামনে হাজির করলেন। তাতে কৃষক জীবনের বর্তমান সমস্যা কয়েকটি আঁচড়ে রেখাচিত্রের মত ফুটে উঠল। সামনে আমরা বসে ছিলাম দুশো আড়াইশো মানুষ। বেশির ভাগই নারী। এমন মনোযোগী দর্শক বা শ্রোতা খুব বেশি পাওয়া যায় না।

আব্দুল আলীমের পল্লীগীতি থেকে আদ্যের গম্ভীরায় যে কয়েকটি কথা পরিষ্কার করার কথা সে কয়েকটি কথা পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু কিছু কথা আমি পরিষ্কার বুঝতেও পারি নাই। সেই আধা বুঝ আধা অবুঝ অবস্থায় আমরাও যা বক্তব্য তা বলে- ঢাকার মেহমানরা- সকাল সকাল ফিরে আসি।

সিঙ্গাইরের উন্নয়ন কর্মীরা (এবং কৃষক জীবনের সাক্ষীচাষীরা) যা বললেন তার সারমর্ম এই দাঁড়ায়:

১. দেশের চাষীরা যে সব কৃষি সরঞ্জাম ও কৃষি উপকরণ- বীজ, সার, কীটনাশক দ্রব্য- কিনছেন সে সবের দাম বর্তমান বাজারের নিয়মে বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে নব প্রবর্তিত 'খাসি ধান' (হাইব্রিড)-এর বীজ বিদেশী কোম্পানির গোলা থেকে কিনতে হয়। চাষী বীজ নিতে পারেন না। কারণ এই ধানে বীজ হয় না। তবে কথায় কথায় বেরিয়ে এল এই ধানে ফলন বেশি হয়। এর ভাত খেতে কেমন তা কেউ বলেন নাই।

২. দ্বিতীয় সমস্যার নাম পরিবেশ রাখা যায়। আরো এক শব্দ যোগ করলে বলা সম্ভব

"পরিবেশ বিপর্যয়"। কীটনাশক দ্রব্য ও সারের ব্যবহারে মাছের ক্ষতি হয়। নানা প্রকার বিলবাওড়, নদীনালায় মাছ হারিয়ে যাওয়ার ফলে গ্রামের গরিব ও মজুর মানুষের জীবনধারণের একটি বড় উৎস হারিয়ে যাচ্ছে। তার জায়গায় তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস জাতীয় মাছের বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে। এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই মাছ তো ইজারাদারি প্রথার সাথে যুক্ত। তাতে গরিবের গতি হয় নাই বলে মাছ ধরার সুযোগ নাই। পুকুর, নদী ইজারাদারের হাতে। ফলে যাকে বলা হয় দশের জায়গা তা আর নেই। এই অবস্থা তো অবস্থা নয়, দশা।

৩. তিন নম্বর কথা শুনতে পেলাম, চাকরি-বাকরি বিষয়ে। সিঙ্গাইরের কয়েকজন উন্নয়ন কর্মী- সম্ভবত ভার্কের আকবর আলী সাহেব- বললেন বাসে যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকায় এখানকার গ্রামবাসী অনেক মেয়ের পক্ষে সাভারে গিয়ে গার্মেন্টসে কাজ নেয়া সম্ভব হয় না। তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হলে মেয়েরা বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে কাজ করতে পারতেন। এখন সাভারে গিয়ে থাকতে হলে তাদের মাস মাস বাসাভাড়া গুনতে হয়। ওখানে আলাদা রান্নাখাওয়ার খরচ বাড়তি কিছু গুনতেই হয়। মাসিক হাজার কি বারোশ টাকা বেতনের এই চাকরি ফলে গলার ঘন্টা হয়ে উঠতে দেরি হয় না। গার্মেন্টস শিল্পের এত বিকাশের কথা শোনা যায়। কিন্তু মজুর শ্রেণীর বেতন এত অবিকাশের অভিশাপে কেন আবদ্ধ ? এই প্রশ্নটাও যৌক্তিক কারণে নিরুত্তর উত্তর পেয়েছে। এ নিয়ে কি করা যায় ? একটা উত্তর : বিশ্ব বাণিজ্য যদি এমন হত আমাদের দেশের পণ্য অবাধে বিদেশের বাজারে ঢুকতে পারত, তবে পণ্যের দাম বাড়ত। তাতে মজুরিও হয়তো বাড়বার একটা সুযোগ পেত।

৪. চার নম্বর সমস্যায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছা গেল। আমি এর নাম রাখছি কোকাকোলা সমস্যা। লোকে এখন গ্রামেও সেভেন আপ, কোকাকোলা ইত্যাদি কঠিন পানীয় খায়। সংবাদপত্রের ভাষায় একে অবশ্য বলে কোমল পানীয়। দেশীয় প্রাচীন পানীয় ডাবের পানির স্থলে কোকাকোলা কিভাবে দেশে আসন গাড়তে পারল? দেশের বড়লোকেরা যা খায় ছোটলোকেরাও তাই খাবে- তাই না? কিন্তু বড়লোকেরা খায় কেন এসব আবর্জনা? বড়লোকেরা যদি কোকাকোলা জাতীয় পানীয়- কঠিন পানীয়- বাদ দিতেন তবে দেশে এর প্রভাব কমতো, নির্ঘাত কমতো।

শুধু পানীয় নয়, সকল ভোগ্যপণ্য এই নিয়ম মেনে চলে। সারা দুনিয়ায় পণ্য অবাধে, বিনা শাসনে দেশে আসতে পারবে। বিজ্ঞাপন দিয়ে লোকের মন জয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এই কানুনকেই আমরা বলি অবাধ বাণিজ্য বা গ্লোবালাইজেশন। এর ভেতর যা আমরা

গীতি নাট্যের মাধ্যমে জনসচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস

এক ব্যক্তির মালিকানার অধিকার হাজার ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও জীবন নষ্ট করার কারণ হচ্ছে। এর সমাধান কি? একজনের মুনাফার অধিকার তাকে বিষ, মাদকদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের সুযোগ দিচ্ছে। এর ফলে হাজার জন নেশাগ্রস্ত হচ্ছে। একদা ইংরেজজাতির অবাধ বাণিজ্য বিস্তারের ফলে চীনে আফিম নামক মাদক সেবা বেড়ে যায়। আজ বাংলাদেশেও বিদেশী বিষাক্ত খাদ্য- যেমন বেবী ফুড, কোকাকোলা, লাক্স সাবান, ভোজ্য তেল সয়াবিন- চলছে

শুনতে ভুলে যাই তার নাম ব্যক্তি মালিকানার বিস্তার। পুঁজির ভিত্তি ব্যক্তি মালিকানা। কাজেই ব্যক্তির নামে পুঁজির প্রসার সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাওয়াকেই বলা হয় পুঁজির দুনিয়াজয় বা গ্লোবালাইজেশন।

অথচ এক ব্যক্তির মালিকানার অধিকার হাজার ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও জীবন নষ্ট করার কারণ হচ্ছে। এর সমাধান কি? একজনের মুনাফার অধিকার তাকে বিষ, মাদকদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের সুযোগ দিচ্ছে। এর ফলে হাজার জন নেশাগ্রস্ত হচ্ছে। একদা ইংরেজজাতির অবাধ বাণিজ্য বিস্তারের ফলে চীনে আফিম নামক মাদক সেবা বেড়ে যায়। আজ বাংলাদেশেও বিদেশী বিষাক্ত খাদ্য- যেমন বেবী ফুড, কোকাকোলা, লাক্স সাবান, ভোজ্য তেল সয়াবিন- চলছে। এর কি সমাধান?

এখন কথা শেষ করি। সিঙ্গাইর উপজেলায় চাষীদের শস্য প্রতিযোগিতাও হয়েছিল। চাষীদের কথাই সেদিন ২৪শে অগ্রহায়ণ বেশি শুনলাম। সারের দাম কমাতে হলে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে এই স্লোগানও শুনলাম। ইউরোপ ও আমেরিকায় কৃষিকর্মকে- ঐ ক্ষেত্রে নিয়োজিত পুঁজিকে- সাহায্য করার জন্য সরকার ভর্তুকি দেয়। বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা গড়ার দশ বারো বছর হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকা নিজ নিজ দেশে ভর্তুকি কমায় নাই। সুতরাং বাংলাদেশে কেন ভর্তুকি দেয়া যাবে না? চাষীদের দিক থেকে এই প্রশ্ন অত্যন্ত যুক্তিসংগত।

এর উত্তর চাষীদের জানা থাকতেও পারে, নাও পারে। ভর্তুকি দেয়া হয় চাষীকে নয় চাষে নিযুক্ত পুঁজিকে। তার কারণ রাজনৈতিক স্বার্থে থাকে, অর্থনৈতিকেও থাকে। বাংলাদেশের চাষ এখনও ছোট ছোট বা মাঝারি চাষীর হাতে। এখানে বড় পুঁজির হাতে চা বাগান আছে। এখন মাছবাজারও তাদের হাতে যাবে। ভর্তুকির প্রশ্ন যারা তুলছেন তারা ক্ষমতাশীল নন বলেই পাচ্ছেন না।

চাষীদের কৃষি উপকরণ যে দামে নিতে হয় তা বেড়ে যাচ্ছে। কারণ বিশ্ববাজারে দাম বাড়ছে। চাষীরা যে ফসল বিক্রয় করবেন তার দাম বাড়ার সুযোগ নাই কেন? কারণ জাতীয় সরকার চালের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখেন ভর্তুকি দিয়েই। চালের দাম যদি সারের দামের সমান বাড়ে, ডিজেলের মত বাড়ে তো মাসে ১০০০ টাকা বেতনে গার্মেন্টস শ্রমিক বাঁচতে পারবে না। চালের দাম কম রাখার খরচটা সরকার দেয়। কিন্তু এর ফলটাও ভোগ করবে গার্মেন্টস মালিক। তিনি টাকার মাপে কম বেতন দিতে পারবেন। আসলে হিসাব থাকে টাকার অংকে দেয়া বেতনে কয় সের চাল কেনা যায় সেভাবে। চালের মাপে বেতন একই রাখতে হলে যখন চালের দাম

বাড়বে তখন টাকায় বেতন বাড়াতে হবে। সরকার যদি ভর্তুকি দিয়ে চালের দাম বাড়াতে না দেয় তবে টাকায় বেতন বাড়াতে হয় না। বেতন দেয় মালিক, ভর্তুকি দেয় সরকার। এভাবে সরকার ভর্তুকি দেয় মালিকপক্ষকেই। তাতে মনে হয় ভর্তুকিটা মজুরকে দেয়া হচ্ছে। আসলে হচ্ছে না। চাষীর ফসলের মূল্য বাড়তে না দিয়ে সরকার চাষীর টাকাটা গার্মেন্টস শিল্প মালিককে দিচ্ছে।

সিঙ্গাইর উপজেলায়ও সেই গান গাওয়া হল। ছোটদের, বড়দের, সকলের, গরীবের, নিঃস্বের, ফকিরের, আমার এ দেশ সব মানুষের। এই গানের সরলতা আমাকে মুগ্ধ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নবিদ্যা বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ আমাকে এই অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করেছে। বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থার পূর্বগামী বিশ্বব্যাংক ও আই. এম. এফ যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থা চালু করেছে বর্তমান অবস্থা বহুলাংশে তারই ফল। কান ও মাথার মত এদের সম্পর্ক।

একটি কথা না বললে এই বিবরণ ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে। কৃষিজাত ফসলের মূল্য চাষী কেন কম পান তার কারণ মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের ভূমিকায় নিহিত। সিঙ্গাইরের নাটকে তার আভাস পেয়েছি। এখানেই ইঙ্গিত পাই দেশীয় সহযোগী না পায় তো বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশে এতটা পাত্তা পেত না। হিসেব কষলে দেখতে পেতাম যা পুঁজির দুনিয়াজয় হিসাবে আবির্ভূত তাতে এদেশের কিছু সুবিধাভোগী মানুষ জড়িত। তারা আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় জড়িয়ে যা উপার্জন করতে পারছেন তাতে তাদের পুঁজিগঠন হচ্ছে। কিন্তু দেশের সর্বনাশ হচ্ছে। দেশে গড়ে উঠছে না শিল্প, না সমৃদ্ধ হচ্ছে কৃষি।

১১ ডিসেম্বর পড়েছিল অগ্রহায়ণের ২৭ তারিখ। সেদিন ঢাকায় আরো বড় এক সমাবেশ হয়। আমাকে সকালবেলায় এক বৈঠকে সঞ্চালকের ভূমিকায় বসতে হয়েছিল। এই বৈঠকে আমার নতুন কোনো জ্ঞান লাভের সুযোগ হয় নাই। সিঙ্গাইরে যা শুনলাম এখানেও সে কথা। পার্থক্যের মধ্যে নানা জায়গার অভিজ্ঞতা যুক্ত হল। কুমিল্লার কথা বললেন নারীপক্ষের মাহিম সুলতান। সেখানে ফসলের দাম চাষী কেন পায় না? চট্টগ্রামের কথা বললেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। সেখানে বেকারত্ব বর্তমান। সাংবাদিক তানিম আহমেদ বললেন কুড়িগ্রাম সদরের অভিজ্ঞতার বয়ান।

সব জায়গার অভিজ্ঞতায় এক আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। কেউ সেটা সাহস করে বললেন। কেউ বললেন না, কেউ আধো আধো বললেন। পুঁজির প্রসার মানে শুধু ধানের প্রসার নয়। দারিদ্র্যেরও প্রসার বটে। পুঁজি মানে নিতান্ত মূলধন নয়। পুঁজি মানে তার অপর- মানে মজুর- ও বটে। সমাজ যে প্রক্রিয়ায় মজুর তৈরি করে তা এক অর্থে পুঁজিরই উৎপাদন। মজুর কোথা থেকে আসবে? স্বভাবতই কৃষি থেকে। কৃষির ভাঙন থেকে বললে আরো স্পষ্ট হয়। ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক কৃষির মহল্লা ছেড়ে কারখানার এলাকায় রপ্তানি না হলে কারখানার শ্রমিক কোথা থেকে আসবে? ওদিকে কৃষিতে নিয়োজিত মানুষজনও কেবল পুঁজির অধীন হতে থাকবেন। বাজারের জন্য উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষক পুঁজির সেবকে পরিণত হয়। সরাসরি মজুর বা ক্ষুদ্র উৎপাদক চাষী- দু'দলই পুঁজির অধীন প্রজা।

বাংলাদেশ বর্তমানে এই ইতিহাসের কারখানায় উৎপাদন করছে। যেমন নির্ধন নিজেকে এবং তেমনই ধনী বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। সিঙ্গাইর ও ঢাকায় দুই সভায় হাজির হয়ে আমার মনে হয়েছে পুঁজির পৌষমাস মানে মজুরের সর্বনাশ। এই বস্তুকেই উন্নয়নবিদ্যা বিভাগ বলছে 'বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রান্তিকীকরণ।' কী সর্বনাশ!

তাদের দাবি ন্যায্য মজুরি

এ্যাকশন এইডের আমন্ত্রণে অনেক দিন পর বগুড়ায় যাওয়া। ১৩ থেকে ১৮ ডিসেম্বর হংকংয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ ও এ্যাকশন এইড দেশের প্রায় ২১ জেলায় আয়োজন করে 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা : দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার প্রান্তিকীকরণ' শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মসূচির।

বগুড়ারা গ্রাম বিকাশ সংস্থা (জিবিএস) ও এ্যাকশন এইড যৌথভাবে এ আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির কারণে যাদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলছে তারা অর্থাৎ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। সভার শুরুতেই এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মন্ত্রী পর্যায়ের ৬ষ্ঠ সম্মেলনে যোগ দেয়া সরকারের প্রতিনিধিদেরকে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে কথা বলার দাবি জানায়। তারা এ সম্মেলনে ধনী দেশগুলোর চাপে যেন সরকারের প্রতিনিধিরা দেশের স্বার্থের কথা ভুলে না যায় তারও অনুরোধ জানায়। আলোচনার পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে গ্রাম বিকাশ সংস্থার সদস্যরা গ্রাফিক্স ও নাটকের মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে, তাদের জীবনে কী প্রভাব ফেলে তা উপস্থাপন করে।

আলোচনা সভায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে তাদের জীবনে কী প্রভাব ফেলছে তা তুলে ধরে বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা বাংলাদেশের মতো গরিব দেশগুলোর জন্য আরো নমনীয় করা প্রয়োজন।

মুক্ত আলোচনায় তারা বলেন, হাইব্রিড ধানের বীজ প্রতিবছর বাংলাদেশকে কিনতে হয়। কিন্তু ওই বীজ থেকে পুনরায় বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। এতে কৃষকগণ তাদের বীজ এবং দেশী ফসলগুলো হারাচ্ছে। এক সময় বিদেশ যদি বীজ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তখন আর কৃষক নিজস্ব বীজ থেকে ফসল উৎপাদন করতে পারবে না। তারা বলেন, গ্রামের মানুষগুলো আগে নিজ বাড়িতে কাপড় তৈরি করত এবং নির্দিষ্ট কতগুলো গ্রামে তাঁত ছিল। কিন্তু অনেক কম দামে বিদেশী কাপড়গুলো সরবরাহ করায় এ দেশের তাঁতশিল্প বিলীন হয়ে যায়। তাঁতশিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন পুঁজি এবং সে অনুযায়ী দক্ষ কারিগরের প্রশিক্ষণ। জেলে সম্প্রদায়ের মহিলাদের কথা উল্লেখ করে তারা বলেন, জেলে সম্প্রদায়ের মহিলারা বাড়িতে জাল বুনত। বর্তমানে কারেন্ট জাল আসায় হাতে তৈরি জালগুলো আর বাজারে বিক্রি হয় না। এবং এর ফলে নারী ও প্রতিবন্ধীরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তারা আরও বলেন, আগে মানুষ বাড়িতে গরু পালন করত এবং লাঙ্গল ও গরু দ্বারা চাষাবাদ করত। কিন্তু বর্তমানে ট্রাক্টর দেশে আসায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করায় মানুষ গরু পালন কমিয়ে দিয়েছে। ফলে কৃষক আর জৈব সার পাচ্ছে না। কৃষি উৎপাদনের জন্য বিদেশী সারের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠকে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে কথা বলার পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য নায্য ও উপযুক্ত মজুরি নিশ্চিত করার বিষয়টি সম্পর্কে যেন জোর দেয়া হয় তার জন্য সুপারিশ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। তারা হংকংয়ের বৈঠকে কৃষি চুক্তিতে ক্ষুদ্র কৃষকদের অধিকার ও স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া এবং পশ্চিমা দেশগুলোর কৃষি ভর্তুকি প্রত্যাহার করারও দাবি জানায়।

রোজিনা ইসলাম

বঞ্চনার জালে

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা : প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা জীবিকায়ন' শীর্ষক একটি সমাবেশ ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ অনুষ্ঠিত হয় নরসিংদী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের সহায়তায় এই সমাবেশের আয়োজন করে গ্রাম বিকাশ সহায়ক সংস্থা। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিগুলো কীভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিকীকরণ করছে সে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন।

সমাবেশে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিও নেতৃবৃন্দ ছাড়াও প্রায় ৮০-১০০ জন গ্রামীণ নারী উপস্থিত ছিলেন, যারা প্রকৃত অর্থে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। সমাবেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও এর তথাকথিত উদার বাণিজ্য নীতির বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার যেসব নীতি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রথাগত জীবনযাপনে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে সেসব নীতির সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনের পরই মুক্ত আলোচনা শুরু হয়।

আলোচনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের বর্তমান চিত্র উঠে আসে। আনুমানিক ষোল বছরের রাজিয়া থেকে চল্লিশোর্ধ্ব মাজেদা সকলেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। অর্থের প্রয়োজনে কৃষি কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে এমন অন্তত সাতজন বিস্তারিতভাবে তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন।

আলাপচারিতায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এরা প্রায় প্রত্যেকেই পারিপার্শ্বিক অসহায়ত্বের দ্বারা পরিচালিত। শিক্ষাজীবন শুরু করেছিল প্রায় প্রত্যেকেই, কিন্তু শেষ করতে পারেনি কেউই। আর্থিক অনটনের অজুহাতে বিবাহিত জীবন বিচ্ছিন্ন হয়েছে অনেকেরই। সচ্ছলতার খোঁজে মিল কারখানায় যে কর্মজীবন গ্রহণ করেছিল তাও যেন যান্ত্রিক। অভাব দূর করা পরের কথা- স্বাস্থ্যগত, পারিবারিক, সামাজিক বাধা অতিক্রম করে চালিয়ে যাওয়া চাকরির বিপরীতে মজুরি বৃদ্ধির দাবি ক্ষুব্ধ করে তোলে কর্তৃপক্ষকে। বেতন বৃদ্ধি বা চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবি কোনোটিই তারা পৌঁছাতে পারেনি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকের কানে। কেননা, তাদের সীমা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপক পর্যন্তই।

কর্মসংস্থানের খোঁজে যারা রাজধানীতে গৃহস্থালীর কাজ নেয়, যান্ত্রিকতার চাপে এবং অব্যাহত শ্রমের দাবিতে তারাও গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

নিত্য অভাব, চাকরি হারানো, আর্থিক প্রয়োজনে শেষ সহায়সম্বল হারানো মানুষগুলো অনেকটা মরীচিকা ধরার আশাতেই গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ঋণের প্রলোভন। এতসবের পরেও কিন্তু মানুষগুলো সচেষ্ট ছিল নিজস্ব সাজপোশাকে আধুনিকতা প্রদর্শনের যা কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই বিরাট একটা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সাথে খাপ খাইয়ে চলার ব্যর্থ প্রচেষ্টারই ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

পরিবারের একজন সদস্য সব কিছু বিক্রি করে ভাগ্যান্বেষণে পাঁচবার বিদেশ পাড়ি দিলেও কোনো সঞ্চয় বা মূলধন নিয়ে ফিরতে পারেনি। এর মধ্যে আবার দু'বার প্রতারিত হয়েছে দালালের খপ্পরে পড়ে। ঘোড়াশাল জুটমিট বন্ধ হয়ে গেলে চাকরি হারায় স্বামী। বাধ্য হয়ে মাজেদা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে আট হাজার ও ব্র্যাক থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। সপ্তাহান্তে ৫০০ টাকা ঋণ শোধ করা তার পক্ষে কঠিন বটে।

আর জ্যোতির পরিবার ব্র্যাক থেকে ১২ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের একটি দোকান চালু করে। পরবর্তীতে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে ব্র্যাকের ম্যানেজার তার ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং এর খেসারত দিতে সে এখন জেলহাজতে।

সমাবেশে এসব আলোচনা থেকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় আনা যায়-

১. বাণিজ্য উদারিকরণ বা বাণিজ্যে অবাধ বিস্তার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে কোনো কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

২. রপ্তানিমুখী বাণিজ্যে শ্রম বা শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি বা মূল্যায়ন নিশ্চিত করা যায়নি।

জীবন নদী রেখাচিত্র উপস্থাপন

৩. উন্নত বিশ্বের বাজারে রপ্তানির সুযোগ মিললেও মালিক বা রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রমিকদের নিরাপত্তায় উন্নত বিশ্বের মত কঠোর আইন প্রণয়ণ বা বাস্তবায়ন করছে না।

৪. রাষ্ট্রযন্ত্র কারখানা স্থাপন ও পরিচালনায় এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করতে মালিকদের প্রচুর সুবিধা প্রদান করলেও কর্মবঞ্চিত শ্রমিকদের শ্রম ও মজুরির নিরাপত্তা বিধানে উদাসীন।

৫. উন্নত বিশ্ব পণ্যে যতোটা আগ্রহী শ্রমের অবাধ যাতায়ত নিশ্চিত করতে এবং দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে ততটা আগ্রহী না। ফলে ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ যাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতারণার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পাচ্ছে না।

৬. অভাব দূর করার আশায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে অভাবী মানুষগুলো। সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার অভাব ক্রমশই তীব্র হয়ে যাওয়ায় বাড়ছে অপরাধ-প্রবণতা ও বৈষম্য। ফলে মোটরসাইকেল চুরির মতো আরো অনেক অভিযোগের জন্ম হচ্ছে।

৭. রপ্তানিমুখী বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে (যেমন প্রাণ জুস) দীর্ঘদিনের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠান (যেমন ঘোড়াশাল জুটমিল) বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে গতি মেলাতে রাষ্ট্রযন্ত্র সঠিক দিকনির্দেশনা নিয়ে এগুচ্ছে না। ফলে কৃষকরা উৎপাদনে আগ্রহ হারাচ্ছে আর শ্রমিকরা হারাচ্ছে কর্মসংস্থান।

৮. দ্রুত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আশায় বৈশ্বিক চাহিদার বিবেচনার কাছে জাতীয় প্রয়োজন অবহেলিত থাকছে। ফলে বিশ্ব বাণিজ্য ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী কোনোভাবেই এক সমীকরণে আসছে না।

৯. বাজার উন্মুক্ত হবার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাকচিক্যপূর্ণ জিনিসে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। প্রলোভিত করছে শহরের মতো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকেও। এর ফলে আয়ের তুলনায় চাহিদা ও ব্যয় দুটোই বাড়ছে। বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা আর সংকুচিত হচ্ছে মানসম্মত দেশী পণ্যের বাজার। এসব পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত শ্রমিকেরা পছন্দের কাজটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

১০. যসব গ্রামীণ মহিলা মিল-কারখানায় চাকরি নিচ্ছে তারা ঠিক ক্ষমতায়নের বা স্বাবলম্বী হবার তাগিদে কাজ করছেনা বরং অভাব থেকে মুক্তি পেতে বাধ্য হচ্ছে কারখানা শ্রমিকের খাতায় নাম লিখাতে।

১১. শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে কোনো অবকাঠামোগত সুবিধা বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা নেই। অনেক ক্ষেত্রে নেই সামাজিক সমর্থন। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনের পরিবর্তে তারা বঞ্চনার জালে আবদ্ধ হচ্ছে। নারীর মনোজগতে এর যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে সমাজে, তার দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য।

হরিণাকুণ্ডু থেকে হংকং...!

শুভ কিবরিয়া

ঢাকা শহরে ভোরের আলো তখনো ভালোভাবে ফোটেনি। সেই আধো অন্ধকার, আধো আলোয় মুঠোফোনের মৃদু ঝাঁকুনিতে টের পেলাম বের হওয়ার সময় হয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি নির্ধারিত স্থানে যাত্রী আমি একাই। ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিই। অলিগলি অনেক চেনা তার। ড্রাইভার শহীদ নামের প্রাণোচ্ছল যুবকটিকে ভালো লেগে যায়। আমরা ঢাকা শহর ছাড়তে শুরু করি। আমিনবাজারের নদী এখন আর নদী নেই। ওখানে বেসাতি বসত গড়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠান পিজিসিবি। মধুমতি মডেল টাউন বেখাপ্পা গড়ন নিয়ে নদীর বুকচিরে ঢিবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও। কুয়াশা সরিয়ে গাড়ি চলছে আর উন্মোচিত হচ্ছে চারপাশে নদী, খাল, জলাশয়, ফ্লাডফ্লো জোনে নানান অবৈধ স্থাপনা। একসময় চোখ বন্ধ করি। ঘুমের আদলে ভুলতে চাই এসব দখল-দাপট। চোখ বুজে কল্পনায় আনি জাগন্ত নদ-নদী, খালে ভরা বাংলাদেশ। কিছুটা দিবাস্বপ্নে মগ্ন হয়ে উঠতে না উঠতেই মুঠোফোন আবার ঝাঁকুনি দিতে থাকে। অপর প্রান্তের তরুণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। ঠিকমতো যাত্রা শুরু করেছি কি না। কোনো অসুবিধা আছে কি না। ফয়সল নামের অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কর্মকর্তা গোছের এই চটপটে তরুণটির দায়িত্ব বর্তেছে আমার যাত্রার দেখভালের। ৭ ডিসেম্বর দুপুরে প্রিয়ভাজন শহীদুর রহমান রোমেলের আমন্ত্রণ পাই আচানক। ঢাকার বাইরে যাবার সময় আছে কি না জানতে চায়! একদিনেই যাওয়া-আসা। ইট-কাঠের জঙ্গল এই ঢাকা ছেড়ে বাংলার প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবার যেকোনো সুযোগই হাতছাড়া করতে চাই না। আমার গন্তব্য ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা।

২

ঢাকা-আরিচা কিংবা ঢাকা-দৌলতদিয়া পথে চলাচল করবার পূর্বঅভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা জানেন এখন এই পথ কত কম সময়ে অতিক্রম করা সম্ভব। সড়কপথে বাংলাদেশের অভাবিত উন্নতি অবাক করার বিষয়। সকাল দশটা নাগাদ আমরা ঝিনাইদহ জেলা শহরে পৌঁছে যাই। ছিমছাম ঝিনাইদহ এখনো কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠেনি। ঝিনাইদহ থেকে যাত্রা শুরু করি হরিণাকুণ্ডুর উদ্দেশে। ঝিনাইদহ শহর থেকে ২১ কিলোমিটার দূরের উপজেলা সদর। ফকির লালন শাহ এখানে জন্মেছিলেন বলে শোনা যায়। দেশের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশের এই জেলা শহর সন্ত্রাস আর রাজনীতির সহিসংতায় আটকে আছে বহু বছর ধরে। যেতে যেতেই শুনি হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান সম্প্রতি খুন হয়েছেন। দেশের অব্যাহত বোমা হামলা এখানকার সবাইকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছে।

৩

দেশের অধিকাংশ থানা সদর ও জেলা সদরের সঙ্গে যেভাবে সড়ক দ্বারা সংযুক্ত, এই উপজেলাটও তার ব্যতিক্রম নয়। এলজিইডির নির্মিত সড়ক ধরেই আমরা চলতে থাকি। মাঝে মাঝে আবিষ্কার করি ছোট ছোট কালভার্ট কীভাবে নদীর গতিপথ সঙ্কুচিত করেছে। উন্নয়নের এ এক বিকৃত চেহারা। রাস্তা চাই। এ জন্য নদী, খাল, বিল তাকে মারতে হবে। প্রকৃতির নিজস্বতার উপরেও আমাদের খোদকারী! পথে দুটো নদীর দেখা পেলাম। জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। এখানকার মাটি খুব ভালো। ফসল ভালো জন্মে। মাঠে সরষে গাছে কেবল ফুল এসেছে। হলুদাভ আভা সবুজ ঢাকছে। অদ্ভুততর মনমাতানো দৃশ্য। রাস্তা একটা বড় বাঁক নিচ্ছে আর মাঝবয়সী বাড়ন্ত খুবই সম্ভাবনাময় একেকটি বটবৃক্ষ দেখছি। বটবৃক্ষ আমাকে খুব আনন্দ দেয়। এরা যেমন ধীরলয়ে বেড়ে ওঠে, যেমন প্রকাণ্ড তার রূপ, তেমনি বিশাল তার হৃদয়। বহু বর্ষ ধরে মানুষকে ছায়া দেয়। আশ্রয় দেয় পাখ-পাখালীদের। গোটা জাতির জীবনে যখন সর্বক্ষেত্রেই বটবৃক্ষের বড় অভাব, তখন এই যাত্রাপথে বেশ কটি বটবৃক্ষ দেখে মনটা ভরে ওঠে আনন্দে। এরই মাঝে কলার বাগান দেখতে পাই। বাণিজ্যিক উপায়ে হাইব্রিড কলা চাষ চলছে। বড় কলার বাজারও চোখে পড়ে একটি। ট্রাকে কলার কাঁধি উঠছে। হরিণাকুণ্ডুর কলা চাষীর বাগান থেকে ফড়িয়ার হাত ঘুরে ট্রাকে চড়ে ঢাকার বাজারে আসছে। প্রশ্ন জাগে, চাষী কি ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে? মধ্যস্বত্বভোগীরা কতটা খেয়ে ফেলছে মাঝপথে? ট্রাকের ভাড়া, রাস্তার চাঁদা এসব সয়ে গ্রামের কলা ঢাকার বাজারে যে দাম নিচ্ছে তার কতোটা ফিরে যাচ্ছে মূল উৎপাদকের কাছে?

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মিলনায়তন চত্বরে পৌঁছে দেখি এলাহি কাণ্ড। মিলনায়তন চত্বরজুড়ে পোস্টার, ফেস্টুন, নানান ইনস্টলেশন। কীভাবে হাইব্রিড ধান আমাদের ক্ষতি করছে, কীটনাশকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, রাসায়নিক সার আমাদের জমির উর্বরতা ধ্বংস করছে তারই নানান ডেমনসট্রেশন। কৃষকের বীজ হারিয়ে যাচ্ছে হাইব্রিড ধান চাষে। বীজের জন্য তাকে আবার বাজারের দুয়ারে হাত পাততে হচ্ছে- এই বক্তব্যটি মন দিয়ে শোনবার মতো। এক সময় আমাদের চাষীরা যে ধান আবাদ করতেন তাতে ফলন একটু কম হয়। অত পানি লাগতো না, অত সার বা কীটনাশক ব্যবহার করতে হতো না। ধানের ফলন থেকে বীজ তৈরি করা যেতো। ধানের নাড়া ঘর ছাওয়া এবং উত্তম পশু খাদ্যের কাজে ব্যবহৃত হতো। হাইব্রিড চাষে ফলন বেড়েছে বটে কিন্তু এত বেশি সার, কীটনাশক, পানি ব্যবহার করতে হয় যে, তাতে উৎপাদন খরচও বেড়েছে ভীষণ। তার ওপর বীজ করা যায় না এই ধান থেকে। এ ধান খুব একটা বড় হয় না বলে নাড়াও হয় না, তা কাজেও লাগে না। মাছের ক্ষেত্রেও একই দশা। হাইব্রিড মাগুর, তেলাপিয়া এসব চাষে দেশী মাছ লাপাত্তা। বিদেশী এসব আগ্রাসন আমাদের দেশী সব ধ্বংস করে দিচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে নিজস্বতা। পোস্টার-ফেস্টুনের ভাষাও তাই। বিদেশী প্রযুক্তি/বিদেশী

আঞ্চলিক সভায় উপস্থিত জনগণের একাংশ

মাথা/হারিয়ে যাচ্ছে কৃষকের/স্বাধীনতা, খাল বিল, পুকুর/সব গেছে ইজারায়/আমরা এখন মাছ/মারব কোথায়? এসব ফেস্টুন আর পোস্টারের ভাষা ভাবায়। উন্নয়নের নামে আমরা গত দু'দশক কী করেছি তারই কদাকার চেহারা আর বীভৎসতার নানা দৃশ্য ভাসতে থাকে চোখের সামনে। মিলনায়তন জুড়ে গ্রামীণ নারী-পুরুষ সমবেত। তারাও নাটক, গান, বক্তৃতা, আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই কথাটিই যেন আমাদের শুনিয়ে গেলো।

৪

১৩-১৮ ডিসেম্বর ২০০৫ আজকের চীনের হংকং শহরে বসছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মোড়লের ভূমিকা নিয়েছে। তার কাজ পশ্চিমের শক্তিমানদের স্বার্থ সুরক্ষা করা। প্রান্তিক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর নানান বিধিনিষেধ আরোপ করা। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের কৃষিতে ব্যাপক ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদিত ফসল বাজারে ছাড়ছে। আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে কৃষিতে ভর্তুকি উঠিয়ে উৎপাদিত ফসল বাজারে ছাড়তে বাধ্য করছে। মুক্তবাজারের অবাধ গতিতে সেই দুই প্রান্তের ফসল বাজারে আসছে। এই অসম, অন্যায্য প্রতিযোগিতায় নিঃস্ব হয়ে পড়ছে গরিব দেশগুলোর কৃষি এবং কৃষকেরা। ক্রমশ ভূমিহীন প্রান্তিকতায় হারিয়ে যাচ্ছে তারা। গ্রামের আদি পেশার মানুষেরা এসব অন্যায্য সিদ্ধান্তের কারণে হারিয়ে ফেলছে তাদের বাজার। কুমার-কামার-তাঁতী-জেলে পরিণত হচ্ছে নিজস্ব পেশাহীন শ্রমিকে। হংকংয়ের সেই ঝলমলে শহরে বসে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বকে নিঃস্ব করবার যে প্রক্রিয়া তারই প্রতিবাদ শোনা গেলো হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মিলনায়তনে। গ্রামের নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী তাদের কথায়, তাদের আলোচনায় সেই দুঃখ দিনকে জাগিয়ে তুললো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ আর অ্যাকশন এইডের যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন মাঠ পর্যায়ে সম্পাদন করলো স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা এসডাপ।

৫

বিশ্বজুড়েই গরিব দেশের সরকার জনগণের পরিবর্তে পশ্চিমের দাতাদের কথা শুনতেই আগ্রহী বেশি। বাংলাদেশের মতো দেশেও সেই হাওয়া বিরাজমান। হংকং আলোচনায় যে ২২ সদস্যের বাংলাদেশী দল যাচ্ছে তার বড় অংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ফেডারেশনের সদস্যরা। আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রী সব সময়ই উদ্ভটতার যুগে বাস করেন। তিনি আদৌ এসব কিছু বোঝেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে জনবিচ্ছিন্ন আমলাদের তৈরি পেপারই হয়তো পড়বেন তিনি। আশার কথা, এই সম্মেলনে

জাতীয় সভায় বক্তব্য রাখছেন একজন

সারা পৃথিবী যেন পণ্যের বাজার। পণ্যে এখন পুণ্য। গ্রামের গহিন ঘরেও এখন মাল্টিন্যাশনালের হাত। মিনিপ্যাক স্যাম্পু, সাবান, কোক, টিস্যু... ইত্যাদি পণ্যে আমাদের পুরো জীবন বিপর্যস্ত। আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, গ্রামীণ জীবনবোধ প্রায় বিলীন। দরিদ্র আরো দরিদ্র হয়ে পড়ছে। কৃষক ভূমিহীন হচ্ছে। ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে

বেসরকারি-পর্যায়ে অনেকেই অংশ নিচ্ছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বেসরকারি অংশই প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়বার প্রত্যয় নিয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে এসব আলোচনা করছিলাম আমরা নিজেরাই। হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ক'জন কর্মকর্তা, স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থার কর্ণধার মিজানুর রহমান, ঐ থানার সাব-ইন্সপেক্টর তাজুল ইসলাম, অ্যাকশন এইডের কর্মী বন্ধুরা মিলে। হঠাৎ খবর এল নেত্রকোনায় বোমা হামলা হয়েছে। নিহত হয়েছেন বেশ ক'জন। আমরা সবাই কিছুটা অবাক। বিস্মিত। শোকাহত। যন্ত্রণাদগ্ধ। আমাদের ঘোর কাটালেন থানার এসআই তাজুল ইসলাম। ভাই দ্রুত চলে যান ঢাকায়। এখানে থেকে কাজ নেই। তিনি নিজেও বিদায় নিলেন দ্রুত। যাবার সময় বললেন, দেখা আর নাও হতে পারে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কায় আছি।

৬

মৃত্যু যখন পায়ের ভৃত্য, প্রতি মুহূর্তে তার বাজনা শুনি। জঙ্গি বোমা হামলা দেশজুড়ে সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। আশঙ্কায়, সন্ত্রস্ততায় গুটিয়ে ফেলছে সবাইকে। শুধু আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর দেখি সরকারি দলে। প্রধানমন্ত্রী থেকে পাতিমন্ত্রী পর্যন্ত। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরো এক কাঠি সরেস। বাবুরনামার বই খুলে তিনি হিন্দু জঙ্গি আবিষ্কারে মত্ত। অক্ষমতা-অপদার্থতা-ষড়যন্ত্রে পারঙ্গম এসব রাজনীতিকই আমাদের ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের দায়িত্বে রত। দেশের এই অব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ সুরক্ষায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাসহ সব বড় সংস্থাগুলো যুক্ত। কর্পোরেটাইজেশন, বিশ্বায়ন, ফ্রি মার্কেট ইকোনমি– এসব তত্ত্ব তালাশে ক্ষুদ্র দেশগুলোর অবস্থা বেহাল। সারা পৃথিবী যেন পণ্যের বাজার। পণ্যে এখন পুণ্য। গ্রামের গহিন ঘরেও এখন মাল্টিন্যাশনালের হাত। মিনিপ্যাক স্যাম্পু, সাবান, কোক, টিস্যু... ইত্যাদি পণ্যে আমাদের পুরো জীবন বিপর্যস্ত। আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, গ্রামীণ জীবনবোধ প্রায় বিলীন। দরিদ্র আরো দরিদ্র হয়ে পড়ছে। কৃষক ভূমিহীন হচ্ছে। ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। আর এই নিঃস্বায়নের প্রক্রিয়ায় বেড়ে ওঠা শ্রমিককেই আমরা পুঁজি বলছি। এই নিঃস্ব মানুষগুলোর সস্তা শ্রমকে ব্যবহার করে তাদের প্রতারিত করে আমরা বিনিয়োগ করছি কিংবা বিনিয়োগ করার ডাক দিচ্ছি। এই হাড় জিরজিরে মানুষের সস্তা শ্রম ঘোষণা করেই মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ গাড়ির যোগান ঘটছে।

এই বিকৃত কদাকার অসাম্য বহনকারী উন্নয়ন ভাবনার খোলনলচে পাল্টাতে হবে। কাজটা রাজনীতির। সমাজের দায়ভারও কম নয়। আমদানিকৃত পণ্যের মতো আমদানিকৃত উন্নয়ন ভাবনাকেও এখন চ্যালেঞ্জ করতে হবে। নদী মেরে সড়ক বানাবো কি না। দেশের পাটকল বন্ধ করে কৃত্রিমতর তন্তুর বাজারে পরিণত হবে কি না। হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে আমার ধানের বৈচিত্র্য অন্যের সিন্দুকে তুলে দেবো কি না। আমার ভর্তুকি তুলে কৃষক মেরে অন্যের বাজারে পরিণত হব কি না? – এসব ভাবনার সময় এখন।

পশ্চিমের ঘোলাজলে চোখ লাল করে নয়, এখন ভাবতে হবে আমাদের নিজেদের মতো করেই। আমাদের উন্নয়ন অধ্যয়নের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, নীতিনির্ধারকরা কি সেই কথাটি শুনবেন?

অভিজ্ঞতা চকরিয়া
প্রান্তিকীকরণ সম্পর্কটি সরলরৈখিক নয়

বিপ্লব মোস্তাফিজ

৮ ডিসেম্বর বাস্তব, চকরিয়ার আয়োজনে 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রান্তিকীকরণ' শীর্ষক সৃজনশীল উপস্থাপনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ বিভাগ, ঢাকা ও অ্যাকশন এইডের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে (মোহনা কমিউনিটি সেন্টার) অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এসএম কামালের উপস্থাপনায় বাস্তব-এর নির্বাহী পরিচালক রুহী দাস সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বাস্তবের প্রকল্প পরিচালক আশরাফুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। আশরাফুল ইসলাম তার বক্তব্যে বাস্তবের কার্যক্রম, ডব্লিউটিও'র সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্তকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের ওপর ডব্লিউটিওর প্রভাব সম্পর্কে বলেন। তিনি উপস্থিত লোককেন্দ্রের সদস্য ও অন্যান্য পেশাজীবী ও অতিথিদের খোলাখুলি কথা বলার আহ্বান জানান।

বাস্তবের ইউনিট ইনচার্জ সৈয়দ ওমর ফয়সাল মূল প্রবন্ধে বাণিজ্যের বিশ্বায়নের নামে মাল্টিন্যাশনাল ও কর্পোরেট হাউজগুলোর কাছে কীভাবে ক্ষুদ্র মূলধন ও আবহমান কাল ধরে পুরুষানুক্রমে চলে আসা ব্যক্তিক জীবিকা পরাজিত হচ্ছে তা চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। প্রান্তিক মানুষগুলো কীভাবে তাদের স্বাধীন পেশা হারিয়ে মাল্টিন্যাশনাল ও কর্পোরেট হাউজসহ বড় পুঁজির কাছে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে তিনি তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি লোককেন্দ্রের সদস্যদের কাছে তুলে ধরেছেন WTO-র বৈঠকের সঙ্গে তাদের জীবন-জীবিকার সম্পর্ক ও করণীয়।

ত্রিবেদীর প্রকল্প সমন্বয়কারী সুজিত দাশ তার বক্তব্যে বিদেশী ও কলের কাপড়ের প্রভাবে কীভাবে তাঁতী সমাজ ধ্বংসের মুখোমুখি তা তুলে ধরেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রান্তিকীকরণ রুখতে বিদেশী অনাবশ্যক প্রযুক্তি ও পণ্য বর্জন করার আহ্বান জানান।

চকরিয়ার সম্পাদক নাজমুল ইসলাম

চকোরিয়ার আয়োজনে সৃজনশীল উপস্থাপনা করছে একদল শিশু

মৎস্যজীবী বলেন, লাঙ্গল-গরুর বদলে ট্রাক্টর এলেও প্রকৃতপক্ষে খরচ কমেনি। কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধির ফলে খরচ আরো বেড়েছে। প্রান্তিক মানুষগুলোকে নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাছের প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তিন পর্যায়ে আমরা বিষ ব্যবহার করি। এ তিনটি পর্যায় হচ্ছে- সার, কীটনাশক ও কেমিক্যাল। ৩ বিশে হয় ৬০। পূর্বে মানুষ ১২০ বছর বাঁচত। এখন তার থেকে ৬০ বছর আয়ু কমে গেছে। এর জন্য দায়ী বড় পুঁজি ও ভুল প্রযুক্তি।

চকরিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আজকের কাগজ আজাদীর প্রতিনিধি সাহাবুদ্দীন সাগর প্রান্তিক মানুষের বোধোদয় ঘটানোর ওপর গুরুত্বারোপ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সাহাবুদ্দীন সাগরের বক্তব্যে এনজিওবিরোধিতা ছিল মুখ্য বিষয়। এছাড়া তার বক্তব্যে ট্রিপিক্যাল মফস্বল সাংবাদিকদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন, অধিকাংশ লবণ উৎপাদিত হয় কক্সবাজারে। কক্সবাজারের মানুষ প্রত্যক্ষ করছে পাশের সবুজ এলাকায় এখন ধান চাষ না হয়ে তামাক উৎপাদন হচ্ছে। তামাক উৎপাদনকারী কোম্পানির বাইরে পণ্য বিক্রি করতে পারে না। এমনকি বাজারে তামাকের মূল্য বাড়লেও কৃষকদের পূর্বনির্ধারিত মূল্যে তামাক বিক্রি করতে হয়। ফলে প্রান্তিক উৎপাদনকারীর স্বাধীনতা খর্ব হয়।

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পানির পরিবর্তে আজ বড় বড় কোম্পানির বাজারজাতকৃত বোতলের পানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। হাইব্রিডের নামে প্রান্তিক কৃষকদের বীজ উৎপাদনকারীদের মুখাপেক্ষী করা হচ্ছে।

ছোট একটি নৌকায় হাতে বোনা জাল নিয়ে একসময় জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। আজ তারা মহাজনের শ্রমিক।

এনজিওসহ অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষিত লোকেরা প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের নামে লুটপাট করে। ডব্লিউটিও, বিশ্বব্যাংকের টাকা খেয়ে গোপনে তাদের পক্ষে কাজ করে। তিনি এ সময় প্রশ্ন তোলেন, এ অনুষ্ঠানে ডব্লিউটিও'র ডোনেশন আছে কি না। এ সময় বাস্তবের নির্বাহী পরিচালক বিষয়টির ব্যাখ্যা দেন।

থানা মৎস্য কর্মকর্তা মঞ্জুরুল আলম বলেন, তেলের ঘানি যারা চালাতো তারা সৌদি আরব চলে গেছে। এ পেশাটি আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্ডার উন্মুক্ত না থাকায় সুতা আমদানি করতে বেশি খরচ হয়। তাঁতীর খরচ বেশি পড়ে। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পেশা টিকিয়ে রাখতে সবাইকে সচেতন হতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

চকরিয়ার এলজিইডি প্রকৌশলী আবদুল বাসেত বলেন, ডব্লিউটিওর সমালোচনা করার আগে স্থানীয় পর্যায়ে যারা হাইব্রিড বীজ, সার প্রচলন করেছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এক সময় কৃষক তাদের উৎপাদিত বীজ ব্যবহার করতো। কিন্তু অধিক উৎপাদনের জন্য তাদের সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উদ্বুদ্ধ করা হয় উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের জন্য। এর ফলে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন জটিলতা। শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রান্তিকীকরণে।

আজ আবার শিক্ষিত সমাজই তাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের বিষয়ে আলোচনা করছে। এতে বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু থাকে?

তিনি এনজিওগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সম্পর্কে বলেন, এনজিওগুলো বিভিন্ন কর্মসূচির নামে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়। কিন্তু তাদের নিজ পেশা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের বিলাস দ্রব্য গ্রহণে প্রলুব্ধ করা হয়। ঋণ থেকে প্রাপ্ত অধিকাংশ টাকা খরচ হয়ে যায় বিলাসদ্রব্য ক্রয়ে, যা না হলেও তাদের চলত। কিন্তু বাণিজ্যের বিশ্বায়নের নামে তাদের বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে ভোক্তা বানানো হচ্ছে বিলাসদ্রব্যের। ফলে তারা শ্রমদাস হতে বাধ্য হচ্ছে।

পেটেন্টের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, আমার বাড়ির একটি নিম গাছের বা অন্য গাছের মালিকানা অন্য কেউ দাবি করলে কিছুই করার নেই।

WTO, IRRI, BRRI এসব সংস্থাকে ডোনেট করে এমন বীজ উদ্ভাবনের জন্য, যাতে সার বেশি লাগে।

তামাক চাষে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাতামুহুরী নদীতে মাছ নেই।

জলদাসপাড়ার আনারকলি জলদাস বলেন, জলদাসরা কিস্তির টাকা দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আগে যারা জাল বুনতো, এখন কমদামে বাজারে তৈরি জাল পাওয়া যাওয়ার ফলে এ পেশা ছাড়তে হচ্ছে।

জলদাসপাড়ার নারায়ণ জলদাস বলেন, আগে সমুদ্রে মাছ ধরতেন। এ পেশা ছাড়তে তারা বাধ্য হচ্ছেন বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে টিকতে না পেরে। ফিশিং বোট, বড় জাল, ইঞ্জিন কেনার ক্ষমতা না থাকায়। তিনি WTO মিটিংয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরার অনুরোধ করেছেন।

লোককেন্দ্রের সভাপতি মোঃ রমজান আলী লবণ চাষ নিয়ে বলেন, আয় থেকে ব্যয় বেশি হচ্ছে। লবণ চাষে এ এলাকার অনেক লোক জড়িত। কিন্তু বিদেশ থেকে লবণ আসার ফলে স্থানীয় লবণের দাম কমে যায়। ফলে লবণচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও জমি ৪০০০ টাকা কানি থেকে বর্তমানে ১৫০০০ টাকা কানি। তাদের উপার্জিত আয় দিয়ে ব্যয় নির্বাহ হয় না। তবে যারা অনেক টাকার মালিক, যাদের লবণ চাষযোগ্য অনেক জমি আছে তারা ভালো আছে।

লবণ চাষ নিয়ে আছিয়া খানম তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, দেশী লবণ ভালো ছিল, রোগ-ব্যাধি ছিল না। এখন বিদেশী লবণের সাথে অনেক রোগ-ব্যাধিও আসছে। এমনিভাবে বাইরের ভোগ্য ও বিলাসদ্রব্যের ব্যবহারে একদিকে খরচ বাড়ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন পেশার লোকজন বেকার হয়ে যাচ্ছে।

মৎস্য সমিতির এক সদস্য জানান, যন্ত্র-প্রযুক্তির সঙ্গে রোগ-শোকও আসছে। তাই আয়ু কমছে। আগে অল্প পানিতে মাছ পাওয়া যেত, এখন গভীর পানি ছাড়া মাছ পাওয়া যায় না। কিন্তু গভীর পানিতে যেতে হলে অনেক পুঁজির দরকার হয়, যা দরিদ্র লোকদের নেই। তাই বড় মহাজনদের কাছে বাধ্য হয়ে তাদের শ্রম বিক্রি করতে হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রান্তিকীকরণ সম্পর্কটি সরলরৈখিক নয়। ডব্লিউটিও'র কার্যক্রম, ছোট-বড় দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ, ছোট ও বড় পুঁজির মধ্যকার পরস্পরবিরোধী স্বার্থ এই বিষয়গুলো আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় শহুরে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেই আলোচিত। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার এই আলোচনা সভায় লোককেন্দ্রের সদস্যরা তাদের নিজেদের জীবন-জীবিকার অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় সমস্যার আলোকে যেভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা এক কথায় অসাধারণ। বিভিন্ন লোককেন্দ্রের সদস্যরা তাদের নিজেদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছেন বিশ্বজনীন টিকে থাকার সংগ্রামকে। ক্ষুদ্র দেশ ও ক্ষুদ্র পুঁজির স্বার্থের প্রতিকূলে ধনী দেশ ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্বার্থে ডব্লিউটিও'র ভূমিকার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা প্রতিরোধে শামিল হওয়ার জন্য নিজেদের অবস্থান তারা পরিষ্কার করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে।

গরিব মানুষের কথা কে বলবে

আসজাদুল কিবরিয়া

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে বাংলাদেশের যে চেহারা ছিল তার অনেকটাই আজ আর নেই। এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন এসেছে, এসেছে অনেক গতিময়তা। এ দেশের নারীরা এখন অফিস-আদালত, কল-কারখানা, মাঠে-ময়দানে সব জায়গাতেই অনেক বেশি কাজ করছে, নিজেরা আয়-উপার্জন করছে। মাইলের পর মাইল পাকা রাস্তা হওয়ায় গ্রাম আর শহরের দূরত্ব কমে গেছে অনেক। অনেক দূরের নির্জন কোনো গ্রামের বাবা-মা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির দেশের কোনো এক শহুরে তাদের ছেলের সঙ্গে এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা বলতে পারছে। এরকম আরো অনেক উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা আর আগের মতো নেই। তারা সবাই বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্ম করছে, বাইরের পৃথিবী যেভাবে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, অতোটা দ্রুত না হলেও পাল্লা দেয়ার চেষ্টা অন্তত করছে।

কিন্তু ঠিক কোন জায়গাগুলোতে বাংলাদেশে বদলেছে বা এগিয়ে যাচ্ছে? সত্যিকারভাবেই কী আমরা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার চেষ্টা করছি? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একটা কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন– যে কানো পরিবর্তনে ভাল-মন্দ দুটোই আসতে থাকে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বাইরে নয় এ দেশের মানুষের চিরাচরিত জীবনধারা। সেই কতকাল আগে থেকে যেভাবে বসবাস করতে, খেয়ে-পড়ে, চলে-ফিরে এখানকার মানুষরা অভ্যস্ত, তার অনেকটাই আজ আর নেই। একইভাবে যেভাবে মানুষজন কাজকর্ম করত, সেটাও অনেক বদলে গেছে।

আমাদের সেই পলাশতলী গ্রামের কথাই ধরা যাক। কিংবা পলাশতলী গ্রামের হাজেরা বিবির কথা। ১০/১২ বছর আগেও হাজেরা বিবির উঠোনে ১০-১২টা মুরগি আর বাড়ির পেছনের বিশাল এজমাইলি পুকুরটায় ৬-৭টা হাঁস চরে বেড়াত। ভোরবেলা খোয়াড় থেকে হাঁস-মুরগি ছাড়ার মাধ্যমেই দিন শুরু হতো তার। মুরগিগুলো যে ডিম পাড়ত, তার ভাগ পড়শীরাও কখনো পেত। আবার কখনো মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা ফুটত। বাড়িতে কখনো কুটুম্ব এলে দু'একটা মুরগি জবাই করে ক্ষেতের চিকন আতপ চালের ভাত রান্না হতো একট উৎসবের আমেজে। গরমের সময় কেউ এলে প্রথমে গাছের ডাব অথবা গাছের লেবুর রস দিয়ে তৈরি শরবত দেয়া হতো। শীতকালে ঢেকিছাঁটা চালের পিঠা তৈরি করতেন হাজেরা বিবি। আর শীতের একটা দিন নির্ধারিত ছিল চিতই পিঠা আর হাঁসের গোশত রান্না করে খাওয়ার জন্য। এখনও কুটুম্ব এলে মুরগি রান্না হয়। তবে মুরগি আসে বাজার থেকে। বাজার থেকে চাল কেনা তো নিয়মিত বিষয়। হাজেরা বিবির ছেলেরা কখনো বা বাজারের বড় দোকান থেকে প্যাকেটের সুগন্ধি চাল কিনে আনে। ডিমের জন্য রাস্তার মোড়ের দোকানে যাওয়া লাগে। কোক, পেপসি, সেভেন আপ তো বলাই বাহুল্য। প্যাকেটের মধ্যে পুরে বিক্রি হওয়ার ফলে রসও আনা হয় কখনো কখনো। ভোরবেলা মোরগের ডাকে এখন আর হাজেরা বিবির ঘুম ভাঙে না। মধ্য রাতে হাঁসেরাও প্রহর ডাকে না।

এজমাইলি পুকুরটা গ্রামের এক মাতবর গোছের লোক ইজারা নিয়েছে আরো কয়েকটা পুকুরের সঙ্গে। হাজেরা বিবির ছোট ছেলে জহের ঐ লোকের অধীনে কাজ করে। নিজেদের পুকুরে একসময় সে পোনা ছাড়ত রুই, কাতলার। নিজেই জাল ফেলে তুলে আনত বড় বড় মাছ। হাঁটবারে মাছ নিয়ে ওমুখো হলে খালি হাতে ফিরেনি কখনো। রাতে হারিকেনের আলোয় ছেলেদেরকে পুকুরের টাটকা মাছের ঝোল আর লাল চালের ভাত খাওয়াতেন হাজেরা বিবি। ঐ ছেলে এখনো জেলেগিরি করে। তবে তার নিজের কোনো পুকুর নেই। মাতবরের ইজারা নেয়া পুকুরগুলোয় আরো কয়েকজনের সঙ্গে সে কাজ করে। কাজ থাকলে দিন মজুরি পায়। না থাকলে বেকার। হাটে বসে সময় কাটায়। চেষ্টা করে যদি কেউ কোনো কাজ দেয়। পুকুরগুলোয় এখন দেশী রই-কাতলার পোনা ছাড়া হয় না। তার বদলে কোনোটায় আফ্রিকান মাগুর, কোনোটায় থাইল্যান্ডের পাঙ্গাশ চাষ হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ওঠে। ট্রাকে চেপে মাছগুলো চলে যায় ৪০/৪৫ মাইল দূরে শহরের বাজারে।

হাজেরা বিবির বড় মেয়ে নজুফা থাকে পাশের গ্রাম শোভাপুরে। ছোটবেলা থেকেই নানারকম হাতের কাজ করার শখ। সেই থেকে একসময় তালপাতার পাখা বানানো আর পাটি বুননের শুরু। বিয়ের পরও এসব করে যাচ্ছে। শখের কাজ থেকে সংসারের আয়-উপার্জন খারাপ ছিল না নজুফার। কিন্তু আস্তে আস্তে তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের সবাই শহর থেকে সব কিনে আনে। শীতকালে কাঁথা সেলাই করে দু'পয়সা আসত তাও বন্ধ। সুন্দর প্লাস্টিকের ব্যাগে রঙচঙা কম্বল গ্রামের অনেক বাড়িতেই আছে। এগুলো নাকি আবার বিদেশ থেকে আসে। বছরখানেক আগে শহর থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছিল। নজুফাকে বলেছিল নকশীকাঁথা বুনে 'সাপ্লাই' দিতে। কিন্তু দু'চারটা দিলে হবে না। ডজনকে ডজন দিতে হবে। নজুফা রাজি হয়নি। ওর পক্ষে সম্ভবও না। অথচ ও শুনেছিল, এগুলো শহরে বেশ ভাল দামে বিক্রি হয়, বিদেশেও যায়।

এই ছোট্ট উদাহরণে আমরা বাংলাদেশের পরিবর্তনের কয়েকটি একটি ধরন বোঝানোর চেষ্টা করেছি। হাজেরা বিবির বাসায় সুগন্ধি চালের প্যাকেট কিংবা পেপসি-সেভেনআপ কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। একইভাবে অস্বাভাবিক নয় সুন্দর বিদেশী কম্বল আর আফ্রিকান মাগুর মাছ। যেটা দেখার, সেটা হলো যারা এগুলো কিনছে তারা কতোটা প্রয়োজনে কিনছে এবং কতোটা সামর্থ্য তাদের আছে। এটা হলো ধনী-গরিব সব মানুষকে নির্বিশেষে ভোক্তা বানানোর প্রচেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত।

আবার জহের এখন অন্যের ইজারা করা পুকুরে মাছ ধরার কাজ করছে, সে কতোটা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে? সে না করলে, আরেকজন করবে এই শঙ্কা থেকেই যা পাওয়া যায় তাই লাভ ভেবে হয়তো সে এটা করছে। এটা হচ্ছে দুটো কারণে। প্রথমত, সস্তায় কাজ করার লোকের অভাব নেই। দ্বিতীয়ত, ইজারাদারের অনেক

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষের পক্ষে কথা বলার লোক কম

বেশি টাকা থাকায় সে সবগুলো পুকুর একাই নিয়ন্ত্রণ করছে। কিংবা নজুফার হাতপাখা বানানো। তার পক্ষে সম্ভব নয় এগুলো গন্ডায় গন্ডায় বানিয়ে শহরের কোনো বড় দোকানে নিয়ে বিক্রি করা। অল্প কয়টা হলে কেউ নিতে চায় না। নিলেও দাম ধরে খুব কম। ফলে কোনোভাবেই পোষায় না তার।

এই যে পরিস্থিতি, এটা হলো বড় পুঁজির বা মূলধনের কাছে ছোট পুঁজির অবলুপ্তি। এভাবে ধাপে ধাপে অনেকগুলো গরিব মানুষের অল্প পুঁজি হারিয়ে যাচ্ছে একজন ব্যবসায়ীর কাছে, ঐ ব্যবসায়ীদের পুঁজি আবার গ্রাস করে নিচ্ছে একটি কোম্পানি, আর ঐসব দেশীয় কোম্পানি আবার হারিয়ে যেতে বসেছে বহুজাতিক বিশাল কোম্পানির বিশাল পুঁজির কাছে। পুঁজি হারানো মানুষগুলো তখন তাদের একমাত্র সম্বল, তাদের শ্রম বিক্রি করছে। যে কাজ একসময় সে নিজের টাকা খাটিয়ে করতো, এখন তা করছে অন্যের প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিতে। এরকম হাজার হাজার মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হচ্ছে সস্তায় শ্রম বিক্রি করতে। আবার জহের বা নজুফার মতো আমাদের এইসব মানুষরাই বাজার থেকে ঐসব পণ্য কিনে আনছে। পুকুরে নিজে মাছ চাষ করার সুযোগ হারিয়ে জহের মাঝে-মধ্যেই বাজার থেকে আফ্রিকান মাগুর কিনে আনে।

তাহলে কেন এমনটা হলো? এর উত্তর জানতে হলে বুঝতে হবে ঐ যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার বিষয়টি। সারা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বড় বড় ধনী দেশগুলো একটি সংগঠন বানিয়েছে যার নাম বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও। বলা হয়েছে পৃথিবীর সবগুলো দেশ এর সদস্য। সবার সমান ভোটাধিকার। বলা হয়েছে, এই সংস্থা সারা দুনিয়ায় ব্যবসা করার কিছু নিয়মকানুন ঠিক করে দেবে যা সবাই সমানভাবে মেনে চলবে। এভাবেই তৈরি হবে বিশ্ব বাজার। কিন্তু ধনী দেশ আর গরিব দেশ, বড় দেশ আর ছোট দেশ, সবাইকে যদি একেই নিয়ম সমানভাবে মানতে হয় তাহলে তো সুবিচার করা হলো না। ধনী দেশ তার অনেক উন্নত প্রযুক্তি আর অনেক অর্থ ব্যয় করে যে জিনিস বানাতে পারে, গরিব দেশ তা পারে না। অথচ বিশ্ব বাজারে সবার সমান সুযোগ। সে কারণে গরিব দেশ তার নিজের বাজার খুলে দিলে, অবাধে ধনী দেশের পণ্য আনতে দিলে খুব অল্প সময়েই ঐসব পণ্য চলে আসবে। কিন্তু ধনী দেশে কী পণ্য নিয়ে যাবে গরিব দেশ? এমনিতেই নিজের দেশের বাজারে পরিচিতি গড়ে ওঠেনি পুরোপুরি। তার ওপর সস্তায় বিদেশী পণ্য আসলে দেশীয় জিনিস কিনবে কে? এতে করে মাঝখান থেকে মার খাবে দেশীয় পণ্য। আর তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্বল্প আয়ের শ্রমিক, মজুর ও পেশাজীবীরা। বাংলাদেশেও এমনটি হচ্ছে। অনেক বড় বড় গার্মেন্টস গড়ে উঠেছে। গ্রামের মেয়েরা শহরে গিয়ে গার্মেন্টসে কাজ করছে। কিন্তু তারা যা মজুরি পাচ্ছে, তা দিয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস আর পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া কোনোটাই হচ্ছে না। প্রতিদিন ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করে ক্ষয়ে যাচ্ছে জীবনীশক্তি। হারিয়ে যাচ্ছে কাজ করার ক্ষমতা। তাঁতীরা আর তাঁত বুনছে না। যারা এখনও ধরে রেখেছে, তারা প্রায় সবাই কাজ করছে বড় কোনো কোম্পানিতে কাপড় সররাহ করার। নিজেদের বানানো জিনিস নিয়ে বাজারে বিক্রির অবস্থা নেই তাদের।

এভাবে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় অনেক বড় একটা পরিবর্তন চলে এসেছে বিশ্ব বাজারের এই সময়ে। বাজারের প্রধান নিয়ম হলো এটা শুধু কেনা-বেচা বোঝে, লাভ-লোকসান বোঝে। বাজারের কাছে মানুষের জীবন ও জীবিকার কোনো অর্থই নেই যদি না তা বেচা-বিক্রি করা যায়। বিকিকিনির এই খেলা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। নিভৃত পলাশতলী গ্রাম থেকে আলোঝলমলে গগনচুম্বী অট্টালিকার শহর হংকং পর্যন্ত। এই হংকংয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্যমন্ত্রীরা আগামী ১৩-১৮ ডিসেম্বর এক বিশাল বৈঠক করবেন যা নিয়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে ইতিমধ্যে। সেখানে গরিব মানুষের নাম ভাঙিয়ে কথা হবে, কিন্তু গরিব মানুষের কথা হবে না। এমনকি বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের হয়ে যারা যাচ্ছেন, তারাও বলবেন না। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার লড়াইটা তাই সামনের দিনগুলোয় আরো কঠিন হয়ে পড়বে। আর এই খেলায় যখন থাকতেই হবে, তখন অন্যরা কিভাবে খেলছে, সেই কৌশলগুলো জানার চেষ্টাই হবে বদলে যাওয়া জীবন-জীবিকাকে ধরে রাখা ও এগিয়ে যাওয়ার শর্ত।